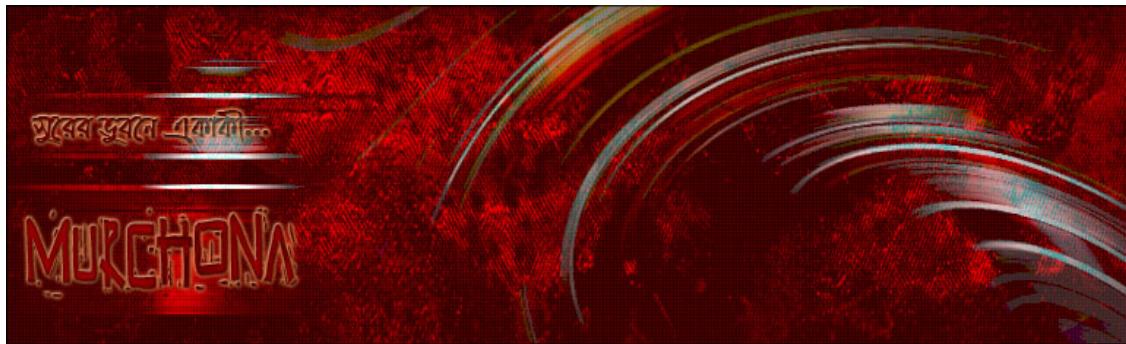


Robinson Crusoe by Danial Difo



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com

MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>

Suman_ahm@yahoo.com

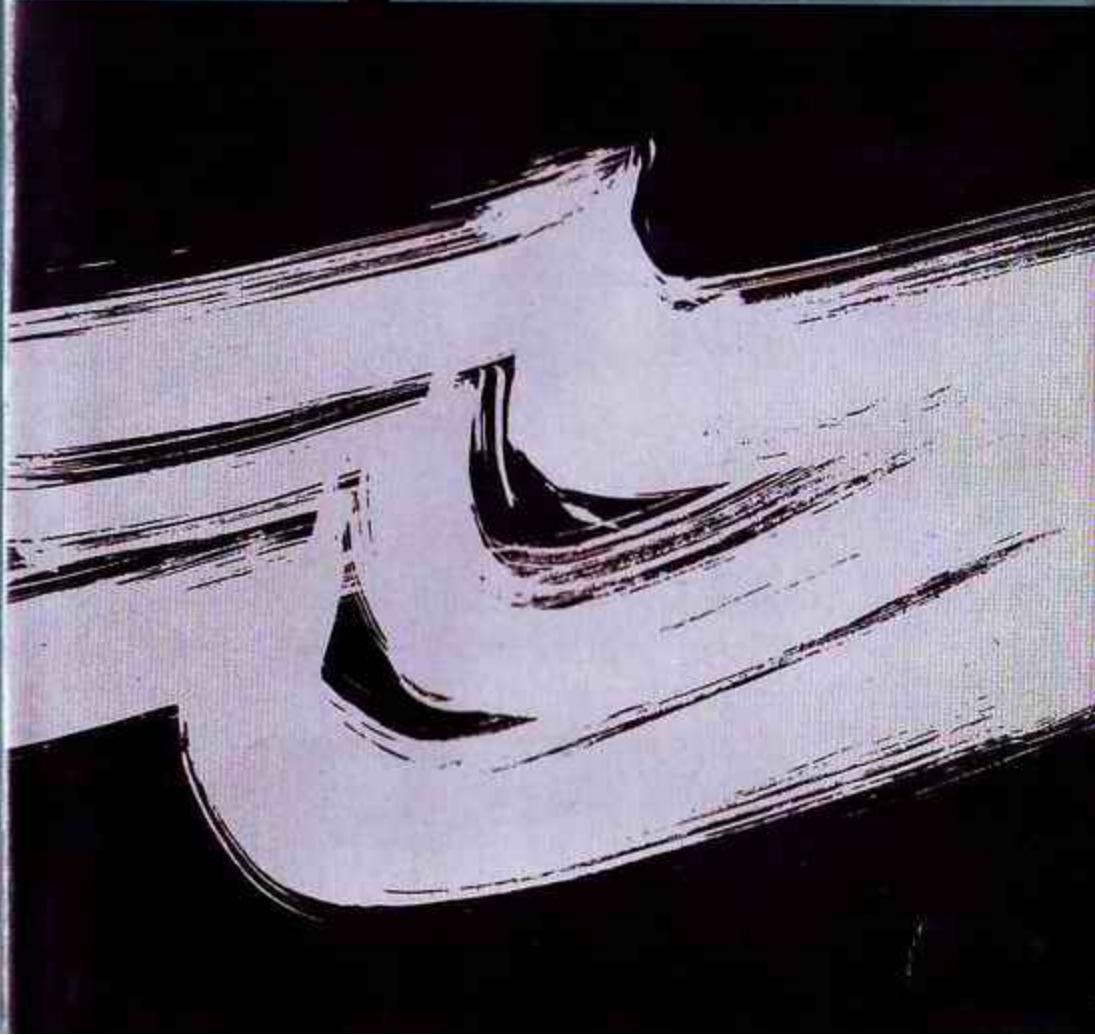
suman_ahm@walla.com

s4suman@yahoo.com

কিশোর ক্লাসিক

রবিনসন ক্রুসো

ড্যানিয়েল ডিফো



মরিয়ার ঘটো। ছুটি আৰ বাবুৰ পিছন ফিরে তাকাই। আসছে না তো কেউ পিছন
পিছন। আমাকে ধৰবে না তো!

জীবনের এও এক বিচিত্র রূপ। তয় যখন আল্পস্টে চেপে ধৰে চারদিক থেকে কী
অস্তুত যে হয়ে যায় মানুষ! নিজের কাছে নিজেই তখন সে হস্যাস্পদ। কোনো
যুক্তিবুদ্ধির তখন আৰ স্থান নেই। আৰ আত্মৰক্ষার সে কী অদয় চেষ্টা! সব ছাপিয়ে
জন্ম নেয় এক নিদারণ হতাশা। তাই তো, কী লাভ আমাৰ এই ঘৰদোৱ আগলে রেখে!
কী প্ৰয়োজন! সব ভেঙেচুৱে তচনছ কৰে দিলেই বা অসুবিধে কী। দেব সব ছাগল ছেড়ে।
দেয়াল ভেঙে ফেলব। শস্যক্ষেত নিজেৰ হাতে দেব লণ্ডন কৰে। যাতে এ দীপে আমাৰ
অবস্থিতি ওৱা কোনোভাবে না টৈৱ পায়। বাগান বাড়িৰ ঐ মাচান—ওটাও ফেলব ভেঙে।
মোটমাট এখানে মনুষ্য বসতিৰ যে সব লক্ষণ আমি তিল কৰে নিজেৰ হাতে গড়ে
তুলেছি তাৰ আৰ কিছুমাত্ৰ অবশেষ রাখব না।

এসব অবশ্য প্ৰথম রাতৰে ভাবনা। রাত বলব না, বলতে গেলে সারাদিন সারারাত।
ঘূৰ কি আৰ আসে! পাৰি কি দুদণ্ড খিতু হয়ে বসতে! ভয়েৰ এটাই তো বৈশিষ্ট্য। ঘটনাৰ
চেয়ে হাজাৰগুণ বড় হয়ে মনেৰ আনাচে কানাচে বাসা বাঁধে। আতঙ্কে থম কৰে রাখে
প্ৰতিটি স্নায়। অস্তুত এক ঘোৱেৰ মধ্যে কেটে যায় প্ৰহৱেৰ পৰ প্ৰহৱ। হায়ৱে, পেতাম
যদি একজন অস্তুত সঙ্গী! যদি তাৰ সাথে আলোচনা কৰতে পাৰতাম। কিংবা স্থিৰ হয়ে
বসে কাদতে পাৰতাম ঘণ্টাৰ পৰ ঘণ্টা, বা স্বৰ্বৱেৰ কাছে প্ৰাৰ্থনা জনাতে পাৰতাম—তবে
হয়ত লাঘব হত আমাৰ ভয়েৰ বোৰা। হয়ত কিছুটা সাঞ্চনাও পেতাম। কিন্তু কোথায় কে!
চারদিকে শুধু ভয় আৰ ভয়। তবে কি আমি পাগল হয়ে যাব!

ভোৱেৰ দিকে নিজেৰ অজানতেই কখন ঘূমিয়ে পড়লাম। গভীৰ ঘূৰ। ক্লান্ত তো
ভীষণ। তদুপৰি দুশ্চিন্তাগৃহ্ণ। উঠলাম যখন ঘূৰ ভেঙে, তখন বেশ বেলা। ভালো লাগছে
বেশ। শৰীৰ মন বেশ কৰ বৰে। ভয়েৰ সেই প্ৰথম ধাঙ্কাটা নেই। এখন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে
ব্যাপারটা নিজেৰ মনেই বিশ্লেষণ কৰতে পাৰছি। ভাবতে বসলাম কেৱ আগামোড়া। একটা
কথা ঠিক যে যাই পায়েৰ ছাপ পড়ুক না কেন, সে দীপেৰ অধিবাসী নয়। কেননা দীপ
আমি তন্ম তন্ম কৰে ঝুঞ্জছি, মনুষ্যবসতিৰ কোনো নিদৰ্শন আমাৰ মজৱে পড়ে নি। তবে
সে নিৰ্যাত আগস্তুক। ডেঙায় চেপে বা ভেলায় কৰে এসেছিল এই দীপে। হয়ত স্বেচ্ছায়,
নয়ত বাতাসেৰ তাড়নায়। বাতাস পড়তে কেৱ নিজেৰ বাসস্থানেৰ দিকে ফিরে গেছে।

মোটমাট একটা কথা আমি হলফ কৰে বলতে পাৰি, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মানুষ
এই দীপে থাকে না। বা এই দীৰ্ঘ পনেৰ বছৱে একটি দিনেৰ তৱেও কোনো মানুষকে
আমি এই দীপমূখো হতে দেবি নি।

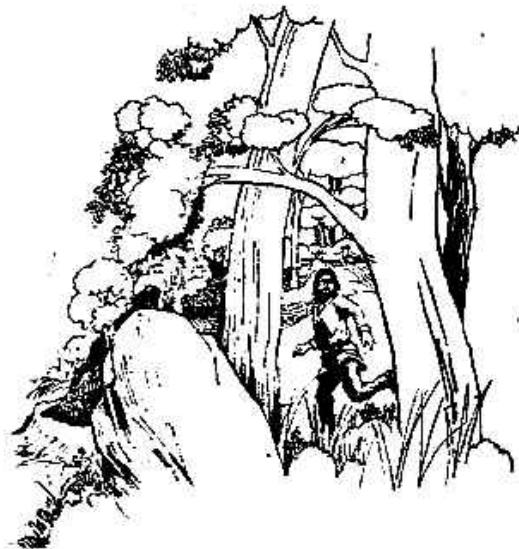
বৰ্বৰ বা নৱাবদকেৰ কথা যদি মন থেকে মুহূৰ্তেৰ জন্যে মুছে ফেলি, তবে দ্বিতীয়
সম্ভাবনা বলতে প্ৰথমেই মনে পড়ে সভা কোনো মানুষেৰ কথা। ধৰে নিতে পাৰি আমাৰই
মতো হয়ত তাৱা পড়েছিল কোনো দুৰ্ভাগ্যেৰ কৰলে। তবে বক্ষা পেয়েছে এটা স্পষ্টত
বুৰুতে পাৱা যায়। স্বোতোৱ তাড়নায় হয়ত তৰী ভেড়াতে বাধ্য হয়েছিল এই দীপে। ছিল
খালিকটা সময়। রাত্ৰে ভাটাৰ টানে আবাৰ যাত্রা কৰেছে গন্ধব্যেৰ দিকে।

এটা নিছকই কষ্ট কল্পনাৰ পৰ্যায়ে পড়ে। জোৱ কৰে সাঞ্চনা পাৰ একটা চেষ্টা। ঘূৰে
ফিরে বাবুৰ মাথায় আসে বৰ্বৰ নৱাবদকেৰ কথা। আৰ ততোই ভয়ে বুক আমাৰ দুৰ
দুৰ কৰে ওঠে।

আৰ কেবল গাল পাড়ি নিজেকে। নিজেৰ কাজ নিয়ে নিজেৰই অনুত্তাপ হয়। কেন

বানাতে গেলাম গুহার আরেকটা দরজা ! কী দরকার ছিল আমার ! এতে করে গুহাটা যে নিছক গুহা নয়, মনুষ্যবসতি—এটা তো যে করুর চোখে ধরা পড়বে। তার উপর বোবার উপর শাকের আঁটি—তুলেছি টানা একটা দেয়াল। মানুষ ছাড়া কেউ কি পারে এমন দেয়াল তুলতে ?—এ তো একটা শিশুও বুঝতে পারবে ! তাহলে উপায় ! এখন এই মুহূর্তে আত্মগোপন করার ব্যাপারটাই প্রধান। দেয়াল সমতে গুহাটাকে আড়াল করতে হবে। লোক চক্ষুর আড়ালে আনতে হবে। তার জন্যে গাছ বসাতে হবে দেয়ালের বাইরের দিকে অর্ধবৃত্তাকারে। বড় হবে সেই গাছ। ঢেকে ফেলবে চারদিক। ভিতরে দেয়াল আছে কি না বাইরে থেকে সেটা কারুর মালুম হবে না।

বসালাম গাছ। দেয়ালটাকেও সঙ্গে সঙ্গে আরো মজবুত করলাম। কাঠকুটো যেখানে যা ছিল সব এনে গেঁথে দিলাম ভিতরের দিক থেকে দেয়ালের গায়ে। আর সাতটা ফুটো করলাম। হাত ঢেকানো যায় এরকম এক একটা ফুটো। জায়গায় জায়গায় আরো মাটি চাপালাম। হল সব মিলিয়ে প্রায় দশ ফুটের মতো পুরু। আর সেই সাতটা ফুটো। নজর



দিহিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছটলাম আমি মরীচার মতো

রাখা যায় চুতদিকে তারই ব্যবস্থা। প্রয়োজন বোধে ফুটোর মধ্যে বন্দুক চুকিয়ে গুলি ছুড়তে পারব। সাতটা গুলি পর পর ছুড়তে আমার সময় লাগবে শোট দুমিনিট। মোটের উপর আপাতত আমি নিজেকে নিরাপদ বলতে পারি। আর কোনো দুঃচিত্তার কারণ নেই। অন্তত ভিতরে যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো নয়ই।

দু'বছরেই গাছ হল বেশ বড় বড়। খুব ঘন করে বসানো তো। তার ডালপালা ছড়িয়ে সে এক কুঞ্জ বিশেষ। দূর থেকে দেখলে চেনার উপায় নেই যে এরই আড়ালে আছে কোনো দেয়াল, আর ভিতরে গুহা, সেখানে কোনো মানুষ থাকে এবং তার উপর ইচ্ছে খুশি যে কোনো রকম আক্রমণ চালানো যেতে পারে। মই বানালাম আরো একটা। সেটা পাহাড়ের দিকে রাখলাম। অর্থাৎ প্রয়োজন বোধে ওদিকে দিয়েও আমি বেরতে বা ভিতরে ঢুকতে পারব।

অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধিতে যতখানি কুলোয়, আমার পক্ষে এই পরিবেশে যা যা করা সম্ভব—নিজেকে রক্ষার প্রয়োজনে সবই করলাম। এছাড়া অন্য কিছু আর আপাতত মাঝায়

খেলছে না। চিন্তা এখন শুধু আমার ছাগলের পাল নিয়ে।

ছেড়ে দেবার চিন্তা বাতুলতা। ছাড়লে আমারই বিপদ। গোলা বাবুদ যে পরিমাণে কমতে শুরু করেছে তাতে আগামী দিনে হাতের কাছে খাদ্য মজুত না থাকলে আমি হয়ত না খেতে পেয়েই মারা যাব। তাছাড়া দূধের যোগানটাও কিছু কম ব্যাপার নয়। সে ক্ষেত্রে কী করণীয়?

অনেক ভাবনা চিন্তা করে দেখলাম, দু'টো মাত্র উপায় আছে ছাগলের পাল রক্ষা করার। এক, যদি আমি মাটির নিচে একটা গুহা মতো করি, সেখানে রাত্রে ঢুকিয়ে দিই পুরো দলটাকে, তোর হলে যদি আবার বের করে এনে খোঁয়াড়ে ছেড়ে দিই—তবে ওরা নিরাপদে থাকবে। না খেয়ে মরবে না এবং সর্বোপরি রাতে কারুর চোখে ওদের অস্তিত্ব প্রকাশ পাবে না। দ্বিতীয় পদ্ধা হল, যদি এক জায়গায় সবাইকে না রেখে দুটো কি তিনটে দলে ভাগ করি এবং এক একটা দলের জন্যে আলাদা আলাদা জায়গা ঠিক করি। এতে সুবিধে এই, চট করে ওরা যে গৃহপালিত জীব এটা ধরা পড়বে না এবং আমারও মাটির নিচে গোপন আন্তর্বাস খোঁড়ার প্রয়োজন হবে না।

দ্বিতীয়টাই প্রথমটার তুলনায় মনঃপৃষ্ঠ হল বেশি। তখন লেগে গেলাম জায়গা খোঁজার কাজে। একটা পাওয়া গেল। দুপাশে গাছের আড়াল, মাঝখানে খানিকটা চতুর মতো। তাতে সবুজ কঢ়ি ঘাস। প্রায় তিন একর পরিমাণ বিচরণের জমি। আমার কাজের পক্ষেও এটা যথেষ্ট সুবিধাজনক। বেড়া দিতে বা ধিরতে বিশেষ একটা পরিশ্রম লাগবে না। বলতে গেলে সব দিক থেকেই আর মনের মতো।

কাজে লেগে গেলাম পরদিনই। মোট সময় লাগল একমাস। চারধারে বেড়া বাঁধা শেষ। কেড়ার ধারে ধারে বসিয়ে দিয়েছি গুল্ম জাতীয় গাছ। তারপর কটা মাদী আরা দুটো মন্দাকে এনে ছেড়ে দিলাম চতুরে। আগের মতো তেজ তো আর নেই। অনেকটা পোষ মানা গোছের ভাব এখন। জ্বোর জববদিস্তি তেমন আর ফলাতে চায় না। দেখি মূল দল থেকে আলাদা হয়েও বেশ স্বচ্ছন্দেই আছে। ব্যস, আমারও স্বাস্থ্য।

জানি না আপনারা ব্যাপারটাকে কী চোখে দেখছেন। এই যে এত পরিশ্রম, এত দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা—সব কিছুর মূলে কিন্তু বালির উপর সেই পায়ের ছাপ। না দেখলে এত খাটোখাটুনির কোনো প্রয়োজনই হত না। এ যেন অজানা অলৌকিকের পানে মোহগ্রন্থের মতো ছুটে যাওয়া। শুধু ছাপ, মালিককে এই দুবছরের মধ্যে বারেকের তরেও দেখতে পেলাম না। জানি না কেমন তার আকৃতি প্রকৃতি। তবে সে যে মনুষ্য, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সভ্য হতে পারে, কিংবা অসভ্য। দু'টাই আমার কাছে সমান ত্রাসের ব্যাপার। মোটমাত্র মানুষের সাম্রিধ্য এখন আমি এড়াতে চাই। তাদের ছায়া দেখলেও জানি না হয়ত আঁকে উঠব। ঈশ্বরের কাছে দিবানিশি এই প্রার্থনা জানাই—প্রভু, আর যাকেই হাজির কর তুমি এই দ্বীপে, সে যেন মানুষ না হয়। অসভ্য বর্বর তো নয়ই, এমন কি সভ্য মানুষও। এই আমার জীবনের সর্বশেষ কামনা। তবে এই শাস্তির আলয়ে অশাস্তির ছায়া ঘনাবে। তোমাকে নিভৃতে ডাকার কাজে ছেদ পড়বে। আমি চাই না সে কাজে কেউ বিঘ্ন ঘটাক।

কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক। কাজের কথা বলি। আমার ছাগলের পালের মধ্যে এক দলকে করেছি নিরাপদ, আরো একদলের নিরাপত্তার ব্যাপার আছে। তারই খোঁজে কদিন সারা দ্বীপ তোলপাড় করে বেড়ালাম। মোটমাত্র থাকতে পারে ওরা নিরাপদে, এমন একটা চমৎকার জায়গা আমার চাই। একদিন, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পৌছেছি পশ্চিম প্রান্তে,

আনমনা তাকিয়েছি সমুদ্রের দিকে—ওমা, দেখি একটা নৌকা ! খুব দূরে ঠিকই তবু চোখে
যেন মুহূর্তের জন্যে ধরা পড়ল। নাকি আমার দেখারই ভুল ! দূরবীন তো আর সঙ্গে নিয়ে
বেড়াই না, গুহ্য বাঙ্গের মধ্যে সফত্বে মজুত আছে। মোট দুটো। সেই নিয়ে এসেছিলাম
জাহাজ থেকে। এত আফসোস হল ! ইস, যদি থাকত এখন একটা সাথে ! ভাবলাম, যাই
ছুটে গিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু সে কি আর একটু দূর। ফিরে আসতে আসতে দিন ফুরিয়ে
সক্ষের ঘোর নামবে। তখন তাড়াতাড়ি কাছের একটা টিলার মাথায় চড়লাম। কই, কিছুতো
নেই ! সুনসান চারধার ! তবে কি আমার ঘনের ভুল ! ভারি দুশ্চিন্তা নিয়ে নেমে এলাম
উপর থেকে। ঠিক করলাম, এবার থেকে দূরবীন সঙ্গে না নিয়ে আমি এক কদমও বাঢ়াব
না।

এবং মোটামুটি এতদিন পরে আমি পায়ের ছাপের একটা যুক্তি খাড়া করতে পারছি।
দৃষ্টি বিভ্রমের ব্যাপার নয়, বারেকের জন্যে হলেও আমি যা দেখেছি সেটা নৌকো।
স্বভাবতই নৌকোর চালক নরখাদক বর্বর। সঙ্গে নির্ধারণ কোনো বন্দী। অর্থাৎ আমারই
মতো কোনো হতভাগ্য, ভুল করে বা অন্য কোনো কারণে হয়ত বা ওদিকের দ্বীপে
জাহাজ ভিড়িয়েছিল। নেমেছে ডাঙায়। অমনি ধরা পড়েছে ওদের হাতে। নৌকোয় করে
বন্দীকে নিয়ে যথা খুশিতে ওরা রওনা দিয়েছে এই দ্বীপের দিকে। জানে তো এখানে
মানুষজন থাকে না। তারপর আর কি ? বন্দীকে হত্যা। তারপর মহানন্দে হৈ চৈ করে
নরমাংসের ভোজ !

এটা যে অলীক কল্পনা নয়, তার প্রমাণ একটু পরেই পেলাম। এই অংশে আগে আমি
কখনো আসি নি। পাহাড় থেকে নেমে কূলের দিকে এগোতে গিয়ে হঠাৎ দেখি, এক গাদা
নরখুলি, হাত পা আর ধড়ের কঙ্কাল, পাশে একটা জায়গায় আগুন জ্বালাবার চিহ্ন, বালি
খুড়ে সেখানটায় ছোটো একটা উনুন মতো করা হয়েছে। অর্থাৎ রান্নাবান্না হয়েছে এখানে
বসেই। কঙ্কাল কটা ফেলে রেখে গেছে।

দেখে আমার তো প্রথম অবস্থায় ভিরমি খাবর যোগাড় ! অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি
তো তাকিয়েই আছি। এই বিপদের হাতে আমিও যে পড়তে পারি যে কোনো মুহূর্তে,
আমারও যে একই দশা হতে পারে—এ চিন্তাটুকুও তখন আর মাথায় নেই। কী ন্যূনস এই
নরখাদকের দল ! পারে এইভাবে রক্তমাংসের একটা জ্যান্ত মানুষকে কেটে কুটে থেতে !
শুনেছি এদের সম্বন্ধে বিস্তর, কিন্তু সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা বলেন্তে গেলে এই প্রথম হল।
সংবিত ফিরে আসতে সে কী যেন্না আমার শরীরে, কী গা গুলানো ভাব ! বমি পাচ্ছে।
এখুনি যেন কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। গায়ে পায়ে এতটুকু যেন জ্বার নেই। উঁঁ,
সে যা অবস্থা ! বেশ কয়েকবার ওয়াক উঠল। শেষে শুধু জল বেরয় মুখ দিয়ে। পেটে আর
তো কিছু নেই। তখন স্বন্তি বোধ করলাম অনেকটা। সুস্থ লাগছে। হাত পায়ের কাঁপুনিও
কমেছে। কিন্তু আর না। এবার পালাতে হবে এখান থেকে। পারছি না সহ্য করতে এই
দৃশ্য। তখন প্রাণপন্থে চোখ সরিয়ে নিয়ে পিছু ফিরলাম এবং কোনোদিকে দ্রুক্ষাত না করে
বনবাদাড় ভেঙ্গে দে ছুটি !

বেশ খানিকটা এসে দাঁড়ালাম এক চমক। তখনো কেমন যেন নেশালাগা ঘোর ঘোর
ভাব। দেখি কড়কড় করছে চোখ। জল গড়িয়ে পড়েছে গাল বেয়ে। অর্থাৎ কান্না। নিজের
অজ্ঞানেই কখন যেন কাঁদতে শুরু করেছি। আকাশের দিকে মুখ তুললাম, স্বরকে
ডাকলাম—প্রভু, আমায় রক্ষা কর, আমি পাপী। বুঝাতে পারি না তোমার মহিমা। তাই

তোমাকে বারে বারে দোষ দিই। তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ। এ আমার পরম আশীর্বাদ।
আমি ধন্য। আমায় ক্ষমা কর।

আহু অনেকটা হালকা লাগছে। চোখের জল মুছলাম। ফিরে গেলাম নিজের বাড়িতে।
ভয়ের বোধটা এখন বলতে গেলে নেই। আসলে এই যে দ্বিপে আসে ওরা কখনো সখনো,
সেটা দ্বিপে কি পাওয়া যায় তার খৌজে নয়, লোকচক্ষুর আড়ালে এই নীরব নির্জনে বসে
ওদের পৈশাচিক প্রবৃত্ত চরিতার্থ করতে। যতদূর অনুমান কূল ছেড়ে ওরা ডাঙায় অব্দি ওঠে
না। জানে তো উঠে কোনো লাভ নেই। এখানে তো আর কিছু মিলবে না। অহেতুক তাই
আর পরিশৰ্ম কেন। তাইতো এই দীর্ঘ আঠার বছর ঐ কটা পায়ের ছাপ ছাড়া আর একটা
ছাপও আমার মন্ডলে পড়ল না। পড়ুক না পড়ুক আমারই বা কীসের অত মাথাব্যথা!
আমি তো আর স্বেচ্ছায় ধরা দিতে আগ্রহী নই। আসুক ওরা, যা খুশি তাই করুক, আমি
যেমন আছি থাকব। ওদের চোখের আড়ালে, নিজেকে যতদূর সম্ভব লুকিয়ে রেখে। অত
দুর্ভাবনা করে আমার লাভ কী!

কিন্তু পারা যায় কি তবু? চিন্তা করা যত সোজা সেটাকে কার্যে পরিণত করা যে ততটাই
কঠিন। ভাবি মনে আর স্থান দেব না ভয় বা আতঙ্ক, ভিতরে বোধটা স্থায়ী ভাবে থেকে
যায়। তাই নিয়ে সদা সর্বদা বিশ্বী এক মনের ভাব। কিছুটা বিষণ্ণ, কিছুটা বা ভয়ার্ত। দুয়ে
মিলে অস্তুত এক থমথমে পরিবেশ। ঘুরি ফিরি বেড়াই,—সব নিজের পরিচিত সীমার
মধ্যে। দূরে কোথাও যাই না। খুব বেশি হলে মাচান অব্দি আমার দৌড়। ছাগল যেখানে সে
অব্দি যেতে ভয় লাগে। ডোঁড়া দেখতেও যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সেটাকে কখনো নিয়ে
আসব যে দ্বিপের এই ধারে—সে চিন্তা ইদানীং মন থেকে বিসর্জনই দিশেছি বলা যায়।
এইভাবেই কেটে যায় দুটি বছর।

তা বলতে গেলে নির্বিশেষই কাটিল। আগের মতোই গতানুগতিক জীবন, শুধু একটু
অধিক মাত্রায় সতর্ক এই যা। চোখ কান আগের চেয়ে একটু বেশি খোলা রাখি।
সন্দেহজনক কোনো কিছু দেখলেই থমকে যাই। খতিয়ে দেখি জিনিসটা কী। নিশ্চিন্ত হলে
তবে এগোই। নতুনা নয়। মোটামাট ধরা আমি কিছুতেই দেব না। পারবে না কেউ আমাকে
অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে কাবু করতে। কাঁধে আমার সর্বদা সজাগ বন্দুক। হিসেব করে
বায়ুদ বা টোটা ব্যবহারের দরকার তো আর এখন নেই। খাদ্য আমার যথেষ্ট পরিমাণে
মজুত। এক পাল ছাগল রয়েছে খামারে। তাদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। নতুন ছাগল ধরবার
প্রয়োজন হলে এখন আর গুলিগোলা ব্যবহার করি না, স্বেফ ফাঁদ পেতে একটার পর
একটাকে ঘায়েল করি। তা হিসেব করে দেখলাম, গত দু'বছরে একটি বারের জন্যেও
আমি গুলি ছুড়ি নি বা ছুড়বার প্রয়োজন বোধ করি নি। তবু বেরলে সঙ্গে কিন্তু বন্দুক
আমার নিত্য সহচর। তিনটে পিস্তলও থাকে। দুটো তো বটেই। কোমরের বেল্টের সঙ্গে
গাঁথা বলতে গেলে। তলোয়ারও আছে। সেটা বেল্টের সঙ্গে বাঁধা। কিন্তু ঐ এক
বাঁমেলা—খাপ নেই তরবারি। সেক্ষেত্রে খোলাই থাকে। সেই অবস্থাতেই আমি
ড্যাঙডেঙিয়ে ঘুরে বেড়াই।

অর্থাৎ সব মিলিয়ে এই আমার বর্তমান জীবন। এর সঙ্গে পুরানো অবস্থাটাকে মেলাতে
বসলে মাঝে মাঝে একটু দুঃখ হয়। পুরানো দিনগুলোতে ছিল অপূর্ব এক শান্তির ভাব,
যাকে বলে নিশ্চিন্ত নিরবেগ জীবন। সেই শান্তি ইদানীং বিপর্যস্ত হয়েছে। তার বদলে
ভয়। তুলনামূলকভাবে এখন আমি বরং খানিকটা দুঃখের মধ্যেই আছি। তুলনা এইভাবেই
হয় কিনা। একের সঙ্গে অপরকে মানুষ তুলনা করে। নিজের অবস্থার সঙ্গে আরেকজনের

অবস্থাকে খতিয়ে দেখে। তবেই না কোনটা ভালো কোনটা মন্দ টের পায়। আমিই বা এর ব্যতিক্রম হই কীভাবে। আর একটা অস্তুত ব্যাপার দেখি ইদানীং—আগের মতো অতটা অভাববোধ আর আমার নেই। আগে সেই যেমন দরকার লাগত এটা ওটা নানান জিনিস—সেই দরকার থেকে জন্ম নিত নানান উপ্তাবনী কৌশল—সব গেছে বর্তমানে স্তৰ্ঘ হয়ে। এটা ভালো এটা মন্দ—এই নিয়ে বাছাবাছিও দেখি ইদানীং বক্ষ হয়ে গেছে। অল্পেতেই এখন যথেষ্ট সন্তুষ্ট বোধ করে থাকি। যেমন মাঝারিনে ভেবেছিলাম যব থেকে হালকা এক ধরনের পানীয় মন্দ বানাব। আগের অবস্থায় থাকলে হয়ত এতদিন বানিয়েও ফেলতাম। কিন্তু এখন আর ঐ সব ঝঝাটে মাথা গলাতে ইচ্ছে করে না। ঢাল নেই তলোয়ার নেই—কীসের অত সখ রে বাপু! তার চেয়ে করব না ভাবলেই তো ল্যাঠ চুক্কে যায়।

এই হল বর্তমানে আমার মনের অবস্থা। শুরে ফিরে একটাই চিন্তা কেবল এখন। কী করে কী কৌশলে যদি আসে দুর্ব্বল শয়তানের দল, তাদের মোকাবিলা করব। আমার



দেখে আমার তো প্রথম অবস্থায় ভিরমী খাবার অবস্থা

অনুমান যদি নির্ভুল হয় তবে এই দ্বিপে নিয়ে আসে তারা বন্দীকে। কেটেকুটে খায়। আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান কীভাবে রক্ষা করব সেই বন্দী জীবন। তাকে বাঁচাব। সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলদেরও ঘায়েল করার ব্যাপার আছে। হত্যা করব তাদের। কিংবা এমন ভয় ধরিয়ে দেব যাতে আর এই দ্বিপে আসার সাহস না পায়। কিন্তু সে কি আমার একলার পক্ষে সম্ভব? আমি একা মানুষ—আর ওরা যদি সংখ্যায় হয় বিশ-বাইশ জন! তিরিশও হতে পারে। সঙ্গে নির্ধারণ থাকবে অস্ত্রশস্ত্র। তীর ধনুক বা বল্লম কি বর্ণ। সেক্ষেত্রে আমি কি পারব বন্দুক নিয়ে ওদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে?

আচ্ছা যদি গর্ত খুড়ি একটা—কেমন হয়? সেই যেখানটায় আগুন জ্বলেছিল। তার মধ্যে বাবুদ রেখে দেব অনেকটা। প্রায় পাঁচ ছ পাউন্ড ওজনের। ওরা যেই ফের এসে আগুন জ্বালবে অমনি বাবুদে ধরে যাবে আগুন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ—ফলে কেউ আর বাঁচবে না!

আপাতদৃষ্টিতে পরিকল্পনা হিসেবে চমৎকার, কিন্তু দু একটি অসুবিধের জায়গাও আছে। প্রথমত অতটা বাবুদ নষ্ট করতে আমার ইচ্ছে নেই, মনের দিক থেকে তেমন সায় পাই না। সংশয় বলতে আছে আর মাত্র এক পিপে। ফুরোতে কতক্ষণ? দ্বিতীয়ত আগুনের কাছাকাছি যে বসবেই ওরা তার কোনো স্থিতা নেই। দূরেও বসতে পারে। সেক্ষেত্র বিশ্ফোরণের আঁচ তাদের লাগবে না। হয়ত শব্দ হবে, কানের পাশ দিয়ে দুমদাম করে বেরিয়ে যাবে কটা আগুনের স্ফূলিংগ, তাতে ভয় পাবে তারা, কিন্তু প্রাণে মরবে না।

এবং সে অবস্থায় আমাকে পালটা কোনো রাস্তা ভাবতেই হচ্ছে। আছ্য যদি অতর্কিতে বাঁপিয়ে পড়ি ওদের উপর! তিনটে বন্দুক তো আমার আছে। তিনটেই থাকবে দুটো করে টোটা ভরা, ওরা হৈ হুঁপোড়ে যেতে উঠবে, অমনি রৈ রৈ চিংকার করে বাঁপিয়ে পড়ব ওদের মাঝখানে। তারপর আর কি—দেদার গুলি। এক এক গুলিতে জোড়ায় জোড়ায় তো পারবই ঘায়েল করতে। এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। বন্দুক ছাড়াও সঙ্গে থাকবে পিস্তল, আর তরবারি। যদি মোট থাকে কুড়িজন,—কুড়িটাকেই আমি খতম করব। করবই। সে মনোবল আমার আছে। তবে আর কি, সেইভাবেই নিজের মনকে প্রস্তুত করি।

ক হস্তা ধরে এই নিয়ে চলল ভাবনার খেয়া। শয়নে শ্বপনে জাগরণে এই আমার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। কীভাবে মহড়া নেব, কীভাবে বন্দুক চালাব, পিস্তলটা থাকবে কোথায়—এই সব নিয়ে কেবলই নানান ফন্দি আঁটি। শেষে এমনই অবস্থা ঘুমের মধ্যেও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম মারপিটের।

জায়গাটাও দেখে এলাম অনেক বার। কোথায় লুকিয়ে থাকব আমি, কোথায় বসলে ওরা আমাকে দেখতে পাবে না কিন্তু আমি নজর রাখতে পারব ওদের প্রতিটি গতিবিধির উপর, সব ঠিক করে ফেললাম। এতে লাভ হল এই—মন থেকে ভয়টা ক্রমশ মুছে যেতে শুরু করেছে। বদলে জন্ম নিচ্ছে ঘৃণা। আর বিদ্বেষ। অদেখা অজ্ঞান সেই বিশ ত্রিশ জন বর্বর শয়তান নরখাদকের উপর বিদ্বেষ।

যেখানে লুকোব সেটা পাহাড়ের ঢালে একটা মস্ত গাছের কোটের। প্রতিটি কার্যবিধি আমি নিখুঁত ভাবে ঠিক করে ফেলেছি। বসে থাকব সেই কোটেরে, ওরা নৌকোয় চেপে আসবে, নামবে তীরে—আমি সব দেখতে পাব। তারপর হয়ত বন্দীকে হত্যা করার প্রস্তুতি নেবে। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার লুকায়িত জায়গা থেকে ছুড়ব গুলি। পর পর কয়েকবার। একের পর এক শয়তান পড়বে মাটিতে লুটিয়ে। ব্যস আমার উদ্দেশ্য সার্থক।

কিন্তু হ্যাঁ, যদি কোনোক্ষে নিশানা ব্যর্থ হয়।

সেটাও ভেবে রেখেছি একই সঙ্গে। কী করব তখন সেটাও ঠিক। যাতে না হয় সেজন্যে বন্দুকে ভরা থাকবে অতিরিক্ত টোটা। ছররা যাকে বলে। একবার ঘোড়া টিপলে একসাথে ছুটে যাবে অনেকগুলো গুলি। একটা না একটা লাগবেই নির্যাত। মূরগি মারার সময় আমি যে ছররা ব্যবহার করে থাকি। তদুপরি পিস্তল তো সঙ্গে রয়েছেই। তাতে থাকবে চারটে করে টোটা। বন্দুকে কাজ না হলে পিস্তল চালাব।

এবং এখন শুধু প্রতীক্ষার পালা। রণকৌশল আমি ঠিক করে ফেলেছি, বলতে গেলে প্রতিটি ইঞ্চি মেপে নির্ভুল। তঙ্গের দিক থেকে এতটুকু ত্রুটি কোথাও নেই। এখন শুধু তাদের আসার অপেক্ষা। আসে কিনা দেখার জন্যে রোজ পাহাড়ের মাথায় দিয়ে উঠি। আমারই বাড়ির গা দেঙ্গে যে পাহাড়টা। দূরবীন দিয়ে চতুর্দিকে নজর বোলাই। কই, পড়ে না তো কিছু চোখে। নৌকো তো দূরের কথা, একটা ভেলা অন্ধি দূর থেকে এদিকে ভেসে

আসতে দেখি না। অথচ তিন তিনটে মাস প্রতিদিন আমার পর্যবেক্ষণের কামাই নেই। তিন মাইল চড়াই ভেঙে পাহাড়ের মাথায় ওঠ। ফের খানিকক্ষণ কাটিয়ে ড্যাঙডেঙিয়ে নেমে আস। ফল প্রতিদিনই শূন্য। দেখা পাই না জনমনিয়ির।

তবে সে জন্যে আমার কোনো হতাশা নেই। কিন্তু যে এখন আমি। আর ভিতরে ভিতরে দারুণ রাগ। বিশ হোক আর ত্রিশ হোক যতজন খুশি আসুক—আমি খুন করবই করব। এটা আমার সংকল্প। নরহত্যার বদলা আমি নেবই। একদিন এই মনোভাব নিয়ে পাহাড়ে উঠছি চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখার জন্যে, হঠাতে একটা অন্তুত চিন্তা মনে উদয় হল। আচ্ছা, এই আমি যা করব বলে ঠিক করেছি—এটা ঠিক তো, না ভুল? স্মরণ যদি নিয়ন্তা হন এই বিশ্বপৃথিবীর, তবে এই যে নরহত্যা ওরা করে, এই যে পাপ—এর বিরুদ্ধে তিনি কোনো পছা গ্রহণ করেন না কেন? পাপীকে শাস্তি দেওয়াই তো স্মরণের কাজ। ওরা কি শাস্তি পায় এই অন্যায়ের জন্যে?

এ যে অন্তুত এক আত্মদর্শন। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের সমস্ত প্রচেষ্টা আমার, সমস্ত চিন্তা সমস্ত উদ্যোগ—সব যেন অর্থহীন বলে মনে হতে লাগল। আশ্চর্য, এ প্রশ্ন আমি এতদিন খতিয়ে দেবি নি কেন! এই যে হত্যা ওরা করে—এমনও তো হতে পারে, পাপ বা অন্যায় ভেবে ওরা করে না। এটা ওদের প্রথা। বন্দীকে হত্যা করতে হয় এটা রেওয়াজ, তাই হত্যা করে। একে তো পাপ বলতে পারি না। কোনো দিক থেকেই এটা অন্যায় নয়। তবে কেন অনর্থক আমি ওদের বিরুদ্ধে রাগে বিদ্বেশে নিজেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শারছি?

পাহাড়ের মাথা অঙ্গি ওঠা আর হল না, মাঝপথে দাঢ়িয়েই এই সব নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এই যে দীর্ঘ তিনমাস ধরে একের পর এক চিন্তা আমি করেছি, বিদ্বেষ বিরোধে পূর্ণ করেছি আমার হৃদয়ের পাত্র—সেটা এখন মনে হচ্ছে সৰ্বৈব ভুল। ভাবছি ওদের আমি হত্যাকারী, আসলে ওরা তা নয়। বন্দী হত্যা যদি অপরাধ বলে ধরি, তবে ইংরেজরা তো অনেক বেশি অপরাধী। যুক্তে বন্দীদের তারা ধরে জেলে ভরে, আজীবন রাখে কারাবাসে, সেখানেই মৃত্যু হয়। এছাড়া যুক্তে যে অগণিত হত্যা হয়, মৃত্যু হয়—তারও মূলে তো তারাই। সেটাই বা কি কম অপরাধ।

একটু ঘুরিয়ে চিন্তা করলে যা ওরা করছে—সে যত নশৎসই হোক না কেন, তাতে আমার কী-ই বা আসে যায়? এরকম কত ঘটনাই তো ঘটে পৃথিবীতে। নানান দেশে। স্পেনীয়রা শুনি দেবদেবীর নামে বন্দী জীবন উৎসর্গ করে। নিষ্ঠুরভাবে তাদের প্রাপ বলি দেয়। কত অত্যচারই তো করল তারা। আমেরিকায় কত হত্যাই না করল। লক্ষ লক্ষ আমেরিকার আদিবাসীকে প্রাপ দিতে হল। এ ব্যাপার নিয়ে যখন কোনো বিবৃতি শুনি, তাতে তো অপরাধ বা অন্যায়ের লেশমাত্র থাকে না, এটাকে প্রচার করা হয় জীবনের এক স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে। সারা ইউরোপের মানুষ একে ন্যায় এবং সত্য বলেই মনে করে। এমনকি দেবদেবীর নামে অপরকে নিষ্ঠুরভাবে উৎসর্গ করাকেও। কই, তার জন্যে তো আমি কখনো কখনে যাই না। নশৎ নিষ্ঠুর বর্ষর আচরণ বলে কখনো ঝাপিয়ে পড়ি না। তবে এই ঘটনা নিয়েই বা আমার এত মাথাব্যথা কীসের?

মোটমাট আমার এতদিনের যাবতীয় প্রস্তুতি, যাবতীয় উদ্যম সব স্তরে করে দিল এই চিন্তা। বলতে গেলে বিরাট একটা যতিচিহ্ন। থমকে গেলাম। নেমে এলাম পাহাড়ের উপর থেকে। আর ভাবব না এসব। অনর্থক কারুর উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে মুখিয়ে যাব না। কী দরকার জবরদস্তি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়া? যদি ওরা আমাকে আক্রমণ করে তখন নয় অন্য কথা। কিন্তু যতক্ষণ করছে না, আমার কবণীয় কী থাকতে পারে।

সে যেন এক নতুন উপলব্ধি আমার। নতুন তবে আগামোড়া সব কিছু বুঝবার ভাববার চেষ্টা করা। কত ত্রুটি যে ছিল আমার পরিকল্পনায়! এতদিন ঘোরের মধ্যে ছিলাম, তাই বুঝতে পারি নি। যেমন, হড়মুড় করে হয়ত গিয়ে পড়লাম ওদের মধ্যে বাঁপিয়ে। ডাইনে বাঁয়ে বন্দুক চালালাম। যরল অনেকে। হয়ত একজন কোনোভাবে ত্রাণ পেল। নৌকো বেয়ে অসীম ক্ষিপ্ততায় ফিরে গেল নিজের দেশে। সেখানে গিয়ে সব কথা বলল, নিয়ে এল হাজার হাজার মানুষ আমার উপর বদলা তুলবার জন্যে। তখন কি আর তিনটে বন্দুক আর তিনটে পিস্তল নিয়ে পারব আমি ওদের সাথে মহড়া দিতে। সেক্ষেত্রে নিজের ধৰ্মস অনিবার্য।

অর্থাৎ কোশলের দিক থেকে হোক কি মীতির দিক থেকে হোক কোনো ভাবেই ওদের বিরুদ্ধাচরণ করা আমার ঠিক না। তাতে নিজেরই ক্ষতি। আমার একমাত্র কাজ হবে এখন নিজেকে ওদের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখা। সেই সাথে আমি যে এখানে আছি সেটা ওদের কোনো ভাবে বুঝতে না দেওয়া।

এর বাইরে অন্য কিছু করার অধিকার আমার নেই। এটা আমি ধর্মের নিরিখ থেকে বলছি। খোদার উপর খোদকারী করা কি মানুষের সাজে! এই তো ঈশ্বরের সাজানো বাগান। এই বিশ্ব দুনিয়া। সেখানে যে যার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে সাজিয়ে নিয়েছে সে নিজের নিজের নিয়মে। ঈশ্বরের সমর্থন আছে বলেই না সেভাবে সাজাতে পারি। আমি কে এমন ক্ষমতাধর যে সব নিয়ম তচ্ছন্দ করে নিয়ন্ত্রনের অধিকার আমি নিজের হাতে তুলে নেব?

এত শাস্তি পেলাম মনে, এত নিশ্চিন্ত—সে আর বলা নয়। বুক যেন হাল্কা আমার। হাদয যেন পবিত্র। কী পাপই না করতে চলেছিলাম আমি! নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছিলাম। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই না এবারও ত্রাণ পেলাম!—হে ঈশ্বর, আমি তোমাকে আর কীভাবে ধন্যবাদ জানাব! আমি অবোধ, আমি দুর্মতি। তুমি বারেবারে আমাকে আলোর দিশা দাও। আমি অজ্ঞান, তাই আমি বারবার ভুল করি।

পরের একটা বছর এইভাবেই কটিলাম। নিশ্চিন্ত নিরন্দেগ জীবন। কোনো তাপ নেই, উত্তাপ নেই। শুধু সতর্কতা ভীষণ। অহেতুক নিজেকে জড়াব না কোনো ঝামেলায় এটাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। আমি যে এই দ্বীপের বাসিন্দা এটা কোনো ভাবে কাউকে বুঝতে বা জানতে দেব না। যত্রত্র সেই কারণে আর যাই না। উঠি না পাহাড়ের মাথায়। ডোঙাটা যেখানে নোঙ্গের করা ছিল সেখান থেকে দড়ি বেঁধে গুণ টেনে নিয়ে এলাম পুবের কূলে। তোলা ছিল পাল, সেটা নামিয়ে দিলাম। নিয়ে এলাম বাড়িতে। ডোঙায় বাকি যে সব জিনিস রেখেছিলাম সব একে একে বাড়িতে এনে তুললাম। ডোঙাটা রাখলাম পাহাড়ে যেরা এক খাড়ির মধ্যে। মোটগাট কেউ যদি দেখে তুলও বুঝতে পারবে না এটা এই দ্বীপেরই কারুর হাতে তৈরি। ধরে নেবে ভাসতে ভাসতে এসেছে হয়ত সমুদ্রের স্বোতে, কোনো রকমে খাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ব্যস্ এছাড়া অন্য কিছু বুঝবার বা ভাববার কোনো উপকরণ তাদের চোখে পড়বে না।

নিজের গতিবিধিও এখন যারপরনাই নিয়ন্ত্রিত। বাইরে বড় একটা যাই না। নিজের সীমানার মধ্যেই থাকি। কাজের মধ্যে প্রধান এবন দুধ দেয়ানো। তিনটে তো খোয়াড় মোট আমার। তাতে অগুণতি ছাগল। নিয়ে আসি দুধ। নিজের রাম্ভাবান্না করি। আর ভাবি এটা ওটা আকাশ পাতাল। ঈশ্বরের অসীম দয়া তাই না আমি* বেঁচে আছি। যদি আমার অনুমান নির্ভুল হয় তবে এই দীর্ঘ বিশ বছরে ওরা অজস্রবার এসেছে এই দ্বীপে। সেই

বৰ্বৰ নৱখাদকের দল। সংখ্যায় কখনো বিশ কখনো ত্রিশ। এতদিন তো চলাফেরার আমার কোনো নিয়ন্ত্ৰণ ছিল না। যেখানে খুশি যেতাম। খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতাম দ্বীপের প্রতিটি অংশ। সম্বল বলতে হাতে শুধু একটা বন্দুক। তাতে আবার পাখি মারার টোটা ভৱা। যদি সেই অবস্থায় দেবে ফেলত ওৱা। যদি উমাদের মতো আমাকে ধৰবে বলে পিছনে ধৰে আসত! পারতাম আমি নিজেকে রক্ষা কৰতে! ওদের চেয়ে কি জোৱে আমি ছুটতে পাৰি!

শিউৰে উঠি নিজেৰ মনেই। মেৰুদণ্ড দিয়ে শীতল হিমস্রোত বয়ে যায়। প্রত্যক্ষ কৱি কল্পনাৰ দৃষ্টিতে তাৰ পৱেৰ ঘটনাবলী। নিষ্ঠুৰ নিৰ্দয় ভাবে ওৱা আমাকে হত্যা কৱচে, তাৱপৰ পৱম উল্লাসে কেটে কেটে খাচ্ছে আমার গায়েৰ মাংস। সে যে কী বীভৎস, ভাবতে বসলে আৱ বড় নিঃসঙ্গ বোধ হয়। কত একলা আমি এই দ্বীপে, কত অসহায়। এমন কেউ নেই যে আমাকে এই সব বিপদেৰ হাত থেকে রক্ষা কৱতে পাৱে। তখন কামা পায়। তখন দুঃখে বুক ভেঙে যাবাৰ দাখিল হয়। ঈশ্বৱেৰ নাম তখন জপ কৱি মনে মনে। হে ঈশ্বৱ, এই নিঃসঙ্গতায় তুমিই আমার একমাত্ৰ পৱিত্ৰতা। তখন মনে একটু জোৱা আসে।

এ এক অস্তুত নিয়ম। আশ্চৰ্য আমাদেৱ এই জীবন, তত্ত্বিক আশ্চৰ্য জীবনেৰ এইসব অস্তুত বৈশিষ্ট্য। যেন অমোঘ কোনো নিৰ্দেশ। মানুষ পড়ে বিপদেৰ মুখে, হয়ত এমনই সে বিপদ তাৱ কৱবাৰ মতো কোনো কিছুই আৱ নেই। জানে না কোন্ দিকে কোন্ পথে এগোবে বা কীভাৱে ত্ৰাণ পাৰে। সেক্ষেত্ৰে অৰুকাৱে আলোক বৰ্তিকাৱ মতো পথ দেখায় তাকে এই অদৃশ্য নিৰ্দেশ। সেই পথে এগিয়ে সে বিপদ থেকে ত্ৰাণ পায়। আমাৰও জীবন জুড়ে এই অলৌকিক নিৰ্দেশেৰ ছলাকলা। বাবে বাবে পথ যায় ভুল হয়ে, বাবে বাবে বেঠিক হয়ে যায় লক্ষ্য, কী কৱব হাজাৰ চেষ্টা কৱেও ঠিক কৱে উঠতে পাৰি না, তখন অলৌকিক অদৃশ্য নিৰ্দেশ আমাকে পথ দেখায়। সক্ষট থেকে ত্ৰাণ পেয়ে আমি নতুন জীবন নতুন উপলব্ধি লাভ কৱি।

পৱেও বহুবাৰ জীবনেৰ নানান ক্ষেত্ৰে আমি এই সত্য যাচাই কৱে দেখেছি। একভাৱে এগোতে এগোতে পেয়েছি এই নিৰ্দেশেৰ হাতছানি, অমনি থমকে দাঙিয়ে গোটা ব্যাপারটা নতুন কৱে ভেবেছি, পেয়েছি নতুন পথেৰ দিশা। পুৱানো পথ ত্যাগ কৱে আমি সেই নতুন পথে পা বাঢ়িয়েছি।

এৱ অসংখ্য উদাহৱণ আমাৰ এই দ্বীপবাসেৰ জীবনে মজুত আছে। পাঠক ইতোমধ্যেই কিছু কিছু নজিৱ পেয়েছেন। আৱো পাবেন। সময়ে সব উদাহৱণই আমি হাজিৱ কৱব।

মোটমাট অস্তুত এক অস্বাচ্ছন্দ্যেৰ মধ্যে চলছে আমাৰ জীবন। আমাৰ সব হিসেব বদলে গেছ। কত কী বেৱ কৱতাম মাথা খাটিয়ে, সে সব এখন বন্ধ। উদ্বেগে ছেয়ে থাকে সারাক্ষণ আমাৰ মন। কত কিছু যে বাদ দিয়েছি! নিৱাপত্তাৰ প্ৰশুটা যে এখন সৰ্বপ্ৰধান। সেই ভয়ে আগুন জ্বলি না। তৈৱি কৱি না আৱ বাসন। যদি গলগলিয়ে ওঠে ঘোয়া। ঘোয়াৰ কুণ্ডলী অনেক দূৱ থেকে দেখতে পাওয়া যায়। তাতে আমি যে আছি এখানে সেটা অনেকেই অনুমান কৱতে পাৱবে। বিশেষ কৱে যদি নৱখাদকদেৱ চোখে পড়ে! তাই গুলিও ছুড়ি না। শব্দ সহজেই জানান দেয় মানুষেৰ অস্তিত্ব। কাটি না গাছ। তাতে কুড়লে গাছেৰ গায়ে ঘা লেগে শব্দ উঠবে। তৱজ্জেৰ পৱ তৱঙ্গ তুলে বাতাসে ছড়িয়ে ঘাৰে সেই শব্দ। যদি শুনতে পায় ওৱা।

একদিন একটা অস্তুত ঘটনা ঘটল।

অগুন না জ্বেলে তো আৱ উপায় নেই। রান্নাৰ প্ৰয়োজনে জ্বালতেই হবে। তাই

নিরিবিলি একটা জ্ঞানগা দেখে অনেক ভেবেচিত্তে কাটিতে গেছি কাঠ, সামনে পাহাড়ে ছোটো একটা শুহা, কাঠ ইদানীং আমি আর জ্ঞাননী হিসেবে ব্যবহার করি না, পুড়িয়ে কাঠকয়লা বানাই, তাই দিয়ে রান্নার কাজ করি। শুহাটা মোটের উপর আমার পক্ষে আদর্শ। কাঠ পোড়াব এই শুহার মধ্যে, সেক্ষেত্রে গলগলিয়ে ধৌয়া ওঠার ব্যাপার নেই। কাঠ কেটে জড় করে ভাবলাম যাই একবার, সর্বপ্রথম শুহাটা সরেজমিনে পরীক্ষা করে আসি।

চুকে দেখি বেশ বড়সড় যাপের। মুখটা উচু প্রায় সাত ফুট, আমার মতো দুজন মানুষ পাশাপাশি হেঁটে স্বচ্ছন্দে শুহায় প্রবেশ করতে পারে। দৈর্ঘ্যে খুব একটা মন্ত নয়। ঠিক কতটা এই মুহূর্তে বলা যায় না। আর ভাবি অঙ্ককার ভিতরে। চোখে কিছুই ঠাওর হয় না।

আরো ক পা এগোলাম।

ওমা, দেখি অস্তুত এক ব্যাপার—দুটো চোখ, এতক্ষণ কোথায় ছিল জানি না, হঠাৎ যেন অঙ্ককারের বুক চিরে আমার দিকে কটমট করে একদ্রষ্টে তাকিয়ে রইল।

বুক তো আমার শুকিয়ে কাঠ। পা আর চলে না। শ্বাস প্রায় বৰ্জ। না পারি এগোতে না পারি পিছোতে। এ আবার কী ধরনের জন্ত রে বাপু! হিংস্র কি? ঝাপ দেবে এখনি আমাকে লক্ষ্য করে? অঙ্ককারে চোখের অধিকারী যে কে—মানুষ না কোনো জন্ত নাকি অপদেবতা—কিছুই তো মালুম হয় না।

আরো খানিকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর সংবিত ফিরে পেলাম। ধাতঙ্গ হলাম খানিকটা। আর নিজেকে নিজেই সে কী গালমন্দ! কী কটু কথার চোট! বিশ্টা বছর না রয়েছি আমি এই দ্বীপে? আমি এমনই আহাম্মক এটাকে হিংস্র কোনো জন্ত ভেবে ভয় পাচ্ছি? কিন্তু নড়ে না কেন এতটুকু? আসলে কী এর পরিচয়?

অমনি এক ছুটে বাইরে গেলাম, জ্ঞানলাম একখণ্ড কাঠ, নিয়ে ঢুকলাম ভিতরে, ভীষণ উত্তেজনা তখন আমার, তিনি কদম্ব এগোই নি, হঠাৎ শুনি মানুষের গলায় গভীর এক শ্বাস ফেলার শব্দ। তারপর ককানি। যেন ভীষণ দুর্বল কেউ কিংবদ্ধ কিংবদ্ধ নিজের শরীরের কষ্ট প্রকাশ করছে। পাঠক, ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। একটু আগের মনের জ্বোর আমার মুহূর্তে চুপসে গেল বেলুনের মতো। ভীষণ ঘাবড়ে গেছি আমি। মাথায় টুপি পরা, নয়ত হাত দিলে টের পেতাম চুল আমার দাঁড়িয়ে গেছে। কুলকুল করে ঘাম বরছে সারা শরীর বেয়ে। আমার বুদ্ধি বলতে তখন আর কিছু নেই। মৃক স্তৰ্দ্ধ নিশ্চল আমি। কী করা উচিত কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

তখন ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল—এগোও! অমনি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। আলো পড়েছে শুহার চতুর্দিকে। দেখি পায়ের কাছে শোয়া এক বিশালাকৃতি—পাঠা। খুতনিতে মন্ত লম্বা দাঢ়ি দেখলেই বোঝা যায়। মুরুর্ব। হয়ত শোয়াই ছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে প্রাণভয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল বারেকের জন্যে, আমি বেরতে ফের শুয়ে পড়েছে।

পা দিয়ে ঠেলা দিলাম, নড়ল না। আমার ইচ্ছে যেতাবে হোক একে বাইরে বরে করে দেওয়া। মরতে হলে বাইরে কোথায়ও গিয়ে মরুক। কিন্তু শক্তি আর নেই শরীরে। তুলবার চেষ্টা করলাম। অস্তুত তুলে যদি বাইরে কোথায়ও রেখে আসা যায়। অস্তুব ভারী। অগত্যা চেষ্টা ত্যাগ করতে হল। থাকুক না এখানে, মন্দ কী! মরব বললেই তো আর কেউ মরে না। সেক্ষেত্রে মরতে এখনো কয়েকটা দিন লাগবে। ইতোমধ্যে আমারই মতো হঠাৎ ঢাকে যদি কোনো নরখাদক এই শুহায় কোনো কিছুর সন্ধানে, আমারই মতো নির্ধাৎ সে-ও চোখ দেখে ভয় পাবে।

বিশ্ময় পর্ব আপাতত খতম, এবার গুহা দেখার পালা। দেখছি তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। ছোট্ট পরিসর। বার ফুটের মতো চওড়া ভিতরটা, তবে আকৃতি যে সবদিকে সমান তা নয়। এবড়ো থেবড়ো ভাব। অবিশ্য সমতল। শেষ মাথায় এগিয়ে দেখি সরু একটা সূড়ঙ্গ মতো। সেই সূড়ঙ্গ ধরেও বেশ খানিকটা এগোনো যায়। কিন্তু মাথা তুলে ইটা অসম্ভব। সূড়ঙ্গ পথে যেতে গেলে হামাগুড়ি দিতে হবে। ভয় কী আমার। হাতে তো রয়েছে জ্বলন্ত মশালরূপী কাঠ। হামাগুড়ি দিয়ে চলাম এগিয়ে। দেখি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। তখন ক্ষান্ত হলাম। থাক আজ আর নয়। কাল আবার এসে বাকিটা দেখে যাব। তখন সঙ্গে আনব মোমবাতি। যা কিছু নতুন আবিষ্কার কালকেই হবে।

পরদিন যথারীতি এলাম ছাটা মোমবাতি নিয়ে। এ আমার নিজেরই হাতে তৈরি। ছাগলের চর্বি দিয়ে আজকাল আমি ভারি চমৎকার মোমবাতি বানানো রপ্ত করেছি।

একটা পাত্রে রেখে ছাটা জ্বালিয়ে দিলাম একসাথে। চুকলাম গুহায়। সেই সূড়ঙ্গ। চলেছি হামাগুড়ি দিয়ে। একপা দুপা করে একটানা প্রায় দশগজ। সে যে কী সাহস তখন আমার! ভয়ড়ের সব তুচ্ছ। দেখি একটু একটু করে মাথার উপরে ছাদটা উচু হচ্ছে। আরো খানিকটা এগোতে পুরোপুরি উচু। দাঁড়ানো যায় সোজা হয়ে। আর কী বাহার সেই গুহার। আলো হাতে ঢোকা মাত্র আলোয় আলোয় দশদিক আলোময়। ছাদ থেকে দেয়াল থেকে চুতদিক থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আলো। সে প্রায় কুড়ি ফুটের মতো চওড়া আর লম্বা একটা অংশ। কাঁচের মতো বিকম্ভিক করছে তাতে অসংখ্য পাথর। জানি না হীরে কি সোনা কিনা। তবে মূল্যবান যে কোনো ধাতু, এটুকু বুবাতে আমার কোনো অসুবিধে হল না।

আমি তো আনন্দে আত্মহারা। মূল্যবান ধাতু দেখে নয়, এমন একটা অস্তুত গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরে। সব দিক থেকে নিরাপদ। আত্মরক্ষার আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। এতটুকু স্যাংসেতে কি ভেজা ভাব নেই। মেঝে সমতল। কোনো বিছে বা ঐ জাতীয় বিষধর কোনো প্রাণীও নেই। এরকমই তো একটা জ্যাগা খুঁজছিলাম আমি মনে আগে। দরকারী জিনিসপত্র এখানে এনে জমা করে রাখতে পারব। যেমন আমার বারুদ এবং প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্য শস্য। নিজেও প্রয়োজন বোধে আত্মগোপন করে থাকতে পারব। আসুক না হাজারে হাজারে নরখাদক শয়তান। আমার নাগাল পেলে তো!

শুরু হল বারুদ এবং শস্য এনে রাখার কাজ। সমুদ্রে ভাসমান অবস্থায় সেই যে বারুদ বোঝাই পিপেটা পেয়েছিলাম সেটা এবার খুলাম। দেখি জল ভিতরে চুকেছে, তবে তাতে ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই। চার পাশে খানিকটা বারুদ জল লেগে জমে শুকনো খটখটে হয়ে গেছে। যেন নারকোলের খোসা। ভিতরের বেশির ভাগটাই ব্যবহারযোগ্য। পরিমাণে প্রায় ষাট পাউণ্ড ওজনের তো হবেই। সীসের পাতটাও নিয়ে রাখলাম একধারে। এটা আরো বেশি দরকারী। পিটিয়ে পিটিয়ে আমি ছোটে ছোটে ছুরু বানাই।

এদিকে পাঠাটা মরেছে; টানতে টানতে নিয়ে এলাম তাকে বহুকষ্টে বাইরে। মন্ত একটা গর্ত খুড়লাম। সমাধি দিলাম। পচন ধরেছে শরীরে। ইস্তে, সে যা দুর্গৰ্ব।

তেইশ বছর হল এই দ্বিপে। তে-ই-শ-টা বছর। বেশ সুখেই ছিলাম। মাঝখান থেকে হিসেবে সব গোলমাল করে দিল নরখাদকের দল। তাইতো এত বাঞ্ছাট। সব সময় একটা আসের ভাব। মনের গভীরে আতঙ্ক। এটুকু বাদ দিলে আমার চেয়ে সুখী মানুষ আর পৃথিবীতে কে আছে। পোলকে শিখিয়েছি আরো কত কথা। আমার সঙ্গে দিব্য এখন কথা বলে। সে আমার পরম সাম্রাজ্য। বেশ লাগে শুনতে। জানি না কতদিন আর শুনতে পাব। জীবের জন্ম যেমন আছে মৃত্যুও আছে। কবে মরে যাবে পটাঁ করে তা

কি জানি? তবে ব্রাজিলে, শুনেছি কাকাতুয়া নাকি একশ বছর অল্পি বাচে। সেক্ষেত্রে আমিহ আগে মরব, ও বেঁচে থাকবে। আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবে দীপে আর ডাকবে : রবিন ক্রুশো, রবিন ক্রুশো, তুমি কোথায়? এদিকে এস ? নিষ্কল সে ডাক। শুনবে না তো কেউ। কে মরতে আসবে এই দীপে! বিশেষ করে আমাদের দেশের কেউ! তবে না বুঝবে তার ইংরিজি কথার মানে। আর কেউ শুনলে মানে বুঝবে না, ভাববে হয়ত কোনো প্রেত কি পিশাচ—এখানে মরে ভূত হয়েছে, ডেকে বেড়াচ্ছে উমাদের মতো সারাক্ষণ।

কুকুরের সঙ্গলাভ বঞ্চিত হয়েছি দশ বছরের আগে। ঘোল বছরের আয়ু। বুড়ো হয়েছিল, স্বাভাবিক কারণেই মাঝা গেছে। বিড়ালের কণ্ঠ তো আগেই বলেছি। একের পর এক সে যা বাচ্চা দেবর ধূম! একপালকে তো মেরে ফেলতে বাধ্য হলাম। ভয় পেয়ে পালাল বাকি কটা। আমার সেই গোড়ার দিকের মাদী দুটো দেখি তাও আসে মাঝে মাঝে। চোরের মতো। এসে খাবার দাবার সব চুরি করে খেয়ে চলে যায়। শেষে এমন ভয় দেখালাম! তারপর থেকে আর আসে না। মিশেছে জঙ্গলে গিয়ে হয়ত জাতভাইদের সঙ্গে। আমার চেথে কখনো পড়ে না।

দুটো ছাগল ছানা পুরুষ। এটা সাম্প্রতিক ঘটনা। ভারি ভালো লাগে আমার ওদের হাবভাব। গোড়ার দিকে একটু দূরত্ব ছিল। এখন ভেঙে গেছে সে প্রাচীর। আশেপাশেই সারাক্ষণ ঘূরঘূর করে। হাত থেকে খাবার খায়। এরা বড় হলে ফের আমি দুটো ছানা পুরুষ।

বলতে ভুলে গেছি আরো দুটো কাকাতুয়া পুরুষ। কথা বলতে তারাও শিখেছে। কিন্তু পোলের মতো নয়। পোল আমার পরম প্রিয়। এদের যে শেখাব মন দিয়ে, আরো উন্নত করব—সে ইচ্ছেও এখন আর নেই।

দুটো মূরগি আছে পোষা। সামুদ্রিক মূরগি। একদিন ফাঁদ পেতে ধরে এনেছিলাম। তারপর ডানা দিয়েছি ছেটে। দেয়ালের পাশে ঝোপ মতো একটা গাছ—সেখানেই বাসা বৈধে থাকে। আর সারাদিন ঘূরঘূর করে বেড়ায় আমার জমির সীমানার মধ্যে। বেশ লাগে। আমি মুঘল চাখে ওদের হাবভাব লক্ষ করি।

এবং এই সব নিয়ে এতদিন বেশ সুখেই ছিলাম। সুখে থাকারই যে কথা। মাঝখান থেকে নরখাদকের দল দিল সব তোলপাড় করে। আমার সুখ এখন দুঃখে পরিণত হতে চলেছে।

কী জানি, সভ্য সমাজে তো থাকি না, হয়ত সেখানকার নিয়ম কানুন একটু অন্যরকম। তবে আমার মনে হয় সুখ আর দুঃখের ব্যাপারে চির সত্য এই একটিই। জীবনের নিয়মটাই এই মাপের। সুখ থাকবে, স্থায়ী হবে, তাকে ছাপিয়ে আসবে দুঃখ। চাকার মতো এর আবর্তন। এটা আমার জীবনে যেমন, সভ্য সমাজেও হয়ত তেমনই। দুয়ের বিশেষ একটা ফারাক নেই।

ঘটনার বিবরণীতে আবার ফিরে আসি।

এটা ডিসেম্বর। তেইশ বছর এই ক দিন আগে পূর্ণ হল। এখন সূর্যের দক্ষিণায়ন। হিম হিম ভাব। তাকে শীত বলা চলে না। এখন চাষের সময়। মাঠে আমাকে কাজ করতে যেতেই হয়। একদিন ভোর সকালে উঠে গেছি মাঠে। দেখি দূরে কূলের কাছে জলছে আগুন, গলগলিয়ে উঠছে ধোঁয়া। আমি যেখানে সেখান থেকে ঘোটে মাইল দুই তফাং। আমি তো থ। একপাল নরখাদককে এই এতদূর থেকেও দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এত কাছে!

এ দিকটায় তো ওরা আসে না। কিন্তু আজ যে এল !

খুব ভয় পেয়ে গেছি। খোপের আড়ালে আমার তো হাত পা বলতে গেলে স্থির।
নড়াচড়া করারও যেন ক্ষমতা নেই। পরছি না আড়াল থেকে বেরতে কি অন্য কোথাও
যেতে। মহা মুশকিল। দু মাইল তো মাটে দূর—যদি ইঁটতে ইঁটতে ঘুরতে কোনো
কারণে চলে আসে এদিকে ! আমার ক্ষেত্রামার দেখতে পায় ! তবে তো চিন্তি ! ক্ষেত
আছে মানুষ নেই তা কি হয় ! নির্ধারণ ধরে নেবে ওরা আমার অস্তিত্বের কথা। তখন
তল্লাসী চালাবে। ধরে ফেলবে অমাকে। তারপর আর কী—বন্দী এবং হত্যা !

মরিয়ার মতো তখন মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে পিছু হটতে হটতে দেয়ালের কাছ বরাবর
গিয়ে মইটাকে আঁকড়ে ধরলাম। উঠলাম বেঁয়ে একলাকে। মই তুলে ভিতর দিকে বসিয়ে
নামলাম। সরিয়ে নিলাম মই। ব্যস্ত, আপাতত নিশ্চিন্ত।

কিন্তু পুরোপুরি তো নয়। আক্রমণ ওরা যে কোনো মুহূর্তে করতে পারে। আত্মরক্ষার
ব্যবস্থা আমাকে চটপট করে ফেলতে হবে। বন্দুকগুলো তাই গিয়ে নামিয়ে আনলাম। আর



হামাগুড়ি দিয়ে চললাম এগিয়ে

পিস্তল। সাজালাম দেয়ালের উপর পাশাপাশি। তলোয়ার রাখলাম হাতের গোড়ায়। আসুক
দেখি, কার ক্ষমতা আছে আমার সঙ্গে মুরুক !

বসে আছি সেই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দেখি কেউ আর আসে না। দেয়ালের এপাশে
তো আমি—কিছু যে দেখব দূরে সে সুযোগ নেই। তখন মই বেয়ে গুটি গুটি উঠে উঠে
দিলাম। চটপট শৈয়ে পড়লাম দেয়ালের উপর সটান। চোখে লাগলাম দূরবীন। ইঁয়া, স্পষ্ট
দেখা যাচ্ছে এবার। সংখ্যায় মোট ওরা নজন। উদোম ন্যাংটা। বসে আছে আগুনের
চারপাশে গোল হয়ে। আগুন পোয়াচ্ছে কি ? কেন পোয়াবে ? শীত তো নেই, উলটো
গরমই বলা যায়। অর্ধাংশ শিকারের হাড় মাংস এখন আলাদা করা হচ্ছে। যাকে বলে
কাটাকুটি। তাই চুপচাপ। আগুনে পুড়িয়ে যখন খাবে, তখন হয়ত উদ্দাম নৃত্যে মেঝে উঠবে।

সঙ্গে দুটো শাস্পান। টেনে তুলে নিয়েছে ডাঙোয়। জোয়ার তখন। তাই হয়ত এই

কায়দা। হয়ত অপেক্ষায় আছে কখন ভাঁটা পড়বে। তখন ফিরে যাবে।

আমার কি আর নড়া চড়ার অবকাশ আছে। ঠায় দূরবীন লাগিয়ে শুয়ে আছি একভাবে। আর মনে একের পর এক দুশ্চিন্তা। যদি হট করে চলে আসে এদিকে! যদি আমার আস্তানা দেখতে পায়! যদি বন্দী করে। নয় এ যাত্রা এল না, যদি আমার অজ্ঞাতসারে পরের যাত্রায় এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়! মোটমাট ভয়ে আতঙ্কে আমি বলতে গেলো সিটিয়ে গেছি।

আরো অনেকক্ষণ পরে ভাঁটা পড়তে উঠল তারা, শাম্পান টেনে জলে নামাল। ফিরে গেল বাইতে বাইতে। যাত্রা শুরুর আগে ঘটা খানেক ধরে আগুন ঘিরে সে কী নাচের ঘটা। কত রকম তার অঙ্গভঙ্গি। দূরবীনে যতটা ধরা পড়ল আমার মনে ত্রাস সঞ্চার করতে তাই যথেষ্ট। সবাই উদোম। তবে সবাই পুরুষ না তার মধ্যে কোনো নারী আছে—সেটা আমি এত দূর থেকে বুঝতে পারলাম না।

অমনি বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম চটপট। সঙ্গে দুটো পিস্তল আর সেই তলোয়ার। উঠলাম পাহাড়ের মাথায়। সে প্রায় দু ঘটা একনাগাড়ে হাঁটা। ভিতরে ভিতরে ভীষণ উত্তেজিত আমি। এধার থেকে আরো তিনটে শাম্পান ভেসেছে জলে। মোট পাঁচ। চলেছে সবাই অসীম বেগে কূলের দিকে।

ভেবে দেখুন আমার অবস্থা। আতঙ্কে তাসে ভয়ে আমি তো বলতে গেলে মৃক। হতবিহুল অবস্থা আমার। হাঁটতে হাঁটতে তখন কূলের দিকে গেলাম। হাড়ে মাংসে রক্তে সে একেবারে ছড়াছড়ি অবস্থা। কী যে নিষ্কর্ষণ নিষ্ঠুর সেই দৃশ্য। বমি পাচ্ছে আমার। সারা পেট তোলপাড় করে গলার কাছে এসে দলা হয়ে থমকে দাঢ়িয়েছে। গুড়গুড় করে বেরিয়ে এল অনেকখানি। তখন একটু নিষ্কিস্ত লাগল।

মোটমাট দ্বিপে যে শুরা প্রায় আসে এটা ঘটনা। যে কোনো অংশে আসে। আমার অজ্ঞাতসারে। এতদিন দেখি নি নিজের চোখে তাই ভাবতাম শুধু পশ্চিম দিকেই আসে। এটা ওদের নিষ্ঠুর লালসা চরিতার্থ করার জায়গা। আমারও জীবন এবার থেকে ওদের হাতের মুঠোয়। অর্থাৎ শাস্তি আমার সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত।

এবৎ এ অবস্থায় হাত পা শুটিয়ে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। অবিবেচনার কাজও বটে। ঘুরেফিরে আবার সেই পুরানো চিন্তাটা মাথায় উদয় হচ্ছে। খুন করতে হবে এবার, খুন। নিষ্ঠুরতার বদলা খুন করেই নিতে হবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে কখন কোন মুহূর্তে আমার উপর তা তো জানি না। প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি আসে দু দল—এক এক দলে থাকে দশজন কি এক ডজন করে নরখাদক—আমি ছাড়ব না তাদের। অস্তত একদলকে ঘায়েল করব। বাকিরা তখন যাবে পালিয়ে। ফের কখনো না কখনো আসবে। তখন মারব তাদের। তারপর ফের আরেকদল। তারাও পার পাবে না আমার হাত থেকে। এইভাবে একের পর এক ধৰ্মসলীলায় আমি মেতে উঠব। অর্থাৎ আমি মানসিক ভাবে প্রস্তুত। কৌশলগত ভাবেও। ভারি উদ্বেগ আমার মনে। তবু বাঁচতে হবে এটা বড় কথা। আত্মরক্ষা করতে হবে। তাতে যদি একের পর এক খুনের রক্তে আমাকে হাত রাঙাতে হয়, তাও সই। মোটকথা ধরা আমি কিছুতেই সহজে দেব না। বেরব না তেমন। আমার সৌভাগ্য সময় সুযোগ বুঝে এক পাল ছাগল পুরেছিলাম। এই অসময়ে তারা যোগাবে আমার খাদ্য। কতদিন যে তাদের উপর নির্ভর করে চালাতে হবে তা তো জানি না। আগুন একবার জ্বাললে নিভতে সময় লাগে। এক দলকে মারলে বাকি যে দল ফিরে যাবে তারা হয়ত পরের বার নিয়ে আসবে দুশ নৌকো বোঝাই নরখাদক যোদ্ধা। তখন কি আর শুন্দি আমি

এড়তে পারব।

এই ভাবেই কাটল আরো পনেরটা মাস। উদ্বেগই সার, কাউকে আর একটি দিনের তরেও দ্বীপের ত্রিসীমানায় দেখতে পেলাম না। তারপর যে মাস সেটা। হঠাত দেখি একদিন.....
কিন্তু থাক। সে কথা মুহূর্তে নয়। তার আগে আমার মনের অবস্থাটা একটু বিশদ করে
ব্যক্ত করি।

এই পনেরটা মাস বলতে গেলে একটি দিনও নিশ্চিষ্টে ঘুমোতে পারি নি। সে যে কী
অস্থি ! চোখ বুঝলেই চোখের পাতায় ভেসে ওঠে যুদ্ধের দৃশ্য। হয়ত যিন এসেছে একটু
অমনি দেখতে লাগলাম নানান স্বপ্ন। প্রতিটির মাঝেই হত্যা আর হত্যা। একের পর এক
আমি বর্বর হত্যাভিযানে মেঠে উঠেছি। আর কী বক্তু ! তখন ঘুম ভেঙে যায় হঠাত। ব্যস,
ঘুমেরও অমনি ছুটি। সারা রাত আমাকে জেগেই কাটাতে হয়।

এই ঘণ্ট্যে একদিন ঘটল একটা অন্যরকম ঘটনা।

শোলাই যে। সকাল থেকে ভীষণ বাড় আর বৃষ্টি। বিশ্বী আবহাওয়া বলতে যা বোঝায়।
সারা দিনে আমি আর গুহা ছেড়ে বেরই নি। দেখতে দেখতে চোখের সামনে সক্ষ্য হল
রাত ঘনান। আমি প্রতিদিনকার প্রথা মতো বাইবেল খুলে রেখেছি বাতির সামনে। হঠাত
আকাশ ফাটিয়ে গুড়ুম করে একটা বন্দুকের আওয়াজ। যেখ ডাকা নয় এ আমার বুঝতে
অসুবিধে হয় নি। কিন্তু এখানে কে করবে আমি ছাড়া বন্দুকের আওয়াজ !

অবাক হয়েছি নানান ভাবে নানান কারণে এই দ্বীপে আসা ইঙ্গিক। কিন্তু এভাবে অবাক
কখনো হই নি। বিচিত্র কাণ্ড তো !—কে আবার এল এই বিজন বিভূতে ? নাকি সমুদ্রের
বুকেই আওয়াজটা হল। দশদিক নির্জন বলে বাজল এসে আমার কানে ?

তড়িঘড়ি মই বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম। যাবাড়ে গেছি ভীষণ—নয়ত উঠতে গিয়ে দু-দুবার
এমন পিছলে পড়ব কেন ? তা হাকড় পাকড় করে ছুটতে ছুটতে উঠলাম তো গিয়ে মাথায়।
ওঠা মাত্র আরেকটা আওয়াজ আর সঙ্গে বিদ্যুতের যিলিকের মতো রোশনাই। তখন
শব্দের উৎপত্তি কোথায় সেটা আন্দাজ করা গেল। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে এবং
জাহাজ থেকে। হয়ত পড়েছে ঝড়ের মুখে মহা বিপদে, বন্দুক ছুড়ে নিজেদের অবস্থার
কথা জানান দিচ্ছে। এটা প্রথা আমি জানি। কিন্তু কী করতে পারি ? সাহায্য করার কি
কোনো সাজ সরঞ্জাম আমার আছে ? তবে একটা কথা—আমি সাহায্য করতে না পারলেও
ওরা হয়ত পারে আমাকে সাহায্য করতে। অবশ্যই নিজেরা যদি নিরাপদে থাকে।
সেক্ষেত্রে আমার অস্তিত্ব ওদের জানানো উচিত। তাই তড়িঘড়ি কাঠকুটো সংগ্রহ করে সেই
পাহাড়ের মাথাতেই ঝালালাম এক মস্ত আগুন। ভেজাকাঠ, সেটা আমার পক্ষে মঙ্গলই
বলা চলে। গলগলিয়ে উঠতে লাগল ঝোঁয়া। আমি জানি, আগুন নজরে না পড়ুক, ঝোঁয়া
বহুদূর থেকে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে জাহাজ যদি সত্যি সত্যি আশে পাশে কোথাও থেকে
থাকে, তবে ঝোঁয়া ঠিকই ওদের নজরে পড়বে। তখন আরো একবার বন্দুকের আওয়াজ
ভেসে এল। আমি দ্বিতীয় উৎসাহে আরো কাঠকুটো জড় করে আগুনে ফেললাম। কিন্তু সেই
শেষে। তারপর থেকে সারারাত বলতে গেলে কাটল সেই পাহাড়ের মাথায়
নির্ঘূম—জাহাজের টিকিরও দেখা মিলল না।

বসে রইলাম ঠায়।

তোর হতে দেখি ঝলমলে রোদ। নীল নির্মেষ আকাশ। কুয়াশার লেশমাত্র কোথাও
নেই। তখন চারদিকে নজর ঘোরাতে গিয়ে দেখি—ওয়া, ঐ যে কী একটা যেন কূলের
কাছে ভাসছে ! দূরবীন তুললাম চোখের গোড়ায়। কী যে ওটা কিছুতেই মালুম হয় না।

পালও হতে পারে আবার অন্য কিছুও হতে পারে। তবে একটা ব্যাপার অনুমান করতে পারছি—জাহাজই হোক আর নৌকোই হোক—হয়ত মোঙ্গর করে আছে ধারে কাছে কোথাও। দূরবীন চোখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি অংশ দেখতে শুরু করলাম। দেখি জলের নিচে সেই যে ডুব পাহাড়—সেখানে গোন্তা খেয়ে পড়ে আছে একটা জাহাজ। তার প্রায় ভগ্নাদ্বা। তোলপাড় হয়ে গেছে তার সারা শরীর। আহারে বেচারিয়া! কোথায় ভাবছিলাম আমার হবে সাহায্য, এখন দেখি সম্পূর্ণ উলটো ব্যাপার।

হয়ত এমন হতে পারে—আমার আগনুনের ধোয়া ওরা দেখতে পেয়েছে। অমনি তড়িঘড়ি বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে বলে জাহাজের নৌকোয় চেপে আসছিল এই দ্বীপের দিকে পথে বাতাসের তাড়নায় নৌকো সমুদ্রে উলটে যায়। কিংবা এমনও হতে পারে—হয়ত উলটায় নি, ওরা গিয়ে ভিড়েছে সেই নরখাদকের দেশে। ইতোমধ্যে সবাইকে বন্দী করে পিশাচের দল বোধহয় মারশোল্লাসে ঘেতে উঠেছে।

আরো একটা সন্তানবন্ধন আছে। হয়ত এ জাহাজটা বিপদে পড়েছে, কিন্তু সঙ্গী ছিল আর একটা জাহাজ। তাদের কিছু হয় নি। বিপদ থেকে তারাই হয়ত নাবিকদল সহ জাহাজের অন্যান্য সকলকে উদ্ধার করেছে। এতক্ষণে নিরাপদ কোনো দূরত্বে পৌছে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার নিজেকে উদ্ধার করার সন্তানবন্ধন দূর অস্ত।

গেলাম ইঁটাতে ইঁটাতে ডুবো পাহাড়ের দিকে। কূলের কাছ বরাবর হতে দেখি একটি মৃতদেহ। বয়েস কম। পরনে নীল রঙের সুতির জামা আর পাঞ্জুন। পায়ে জুতো মোজা। হৃষ্টড়ি খেয়ে পড়ে আছে বালিতে মুখ গুঁজে। জামার পকেটে তামাক খাওয়ার একটা পাইপ, কিছু টাকা আর কিছু খুচরা পয়সা। এ থেকে কি আর কোনো পরিচয় পাওয়া যায়!

প্রথম দর্শনেই মনটা দুঃখে ভরে উঠল। তবে হয়ত আমার অনুমান ঠিক নয়। হয়ত বাঁচে নি কেউ জাহাজের। আমাদেরই মতো অবস্থা। জাহাজের কাছে গিয়ে যে দেখব সে সুযোগও নেই। সেই ভীষণ স্বোত্ত আর অতি বিপজ্জনক সে অঞ্চল। বরং এই ফাঁকে ডোঁগাটা ব্যবহার করি। উদ্ধার করা যদি সম্ভব হয় কাউকে করব। নয়ত যা পাই জাহাজ থেকে দরকারী জিনিস—নিয়ে আসব।

অমনি ফিরে গেলাম গুহায়। যাত্রার আয়োজন করতে হবে। মিলাম কুটি, এক কলসী পানীয় জল, কম্পাস, এক বোতল মদ, এক ঝুঁড়ি কিসমিস—ব্যস, আর কিছু নেবার দরকার নেই। ডোঁগাটা অর্ধেক ডুবিয়ে রেখেছিলাম নিরাপত্তার প্রয়োজনে জলের নিচে। জল তুলে ছেঁকে ফেলতে ভেসে উঠল ফের জলের উপর। মুছে নিলাম। মালপত্র রাখলাম জড় করে। কী মনে হতে চালও নিলাম খানিকটা। ছাতি আর বন্দুক তো আছেই। আমার নিত্য সহচর। ঘোটমাট সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত। এবার দৈশ্বরের নাম স্মরণ করে রওনা দিলেই হয়।

ভাসল ডোঁগা জলে। কূলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে চলে এলাম ডুবোপাহাড়ের কাছ বরাবর। এবার যেতে হবে জাহাজের কাছে। কিন্তু ভয় খুব। সেই বিপজ্জনক স্বোত্ত। যদি ফের ভেসে যাই মাঝ দরিয়ায়। আগের সেই অবস্থার কথা স্মরণ করে বুকে ইতোমধ্যেই হাতুড়ি পেটা শুরু হয়েছে। স্বোত্ত তো বরং ভালো, যদি ওঠে ঝোড়ো বাতাস! তবে কি আর পারব আগের বারের মতো ফিরে আসতে!

ছোটো একটা খাড়িতে ডোঁগা ঢুকিয়ে ভাবতে বসলাম। এখন শুধু প্রতীক্ষা। যে ভাবে স্বোত্ত বইছে তু বেগে, তাতে স্বোত্ত ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা করাও বাতুলতা। এখন আবার জোয়ারের সময়। বাড়ছে জল। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। উপায় বের করতে

হবেই। কিন্তু কী সেই উপায়?

তখন নামলাম। হাঁটতে হাঁটতে ডুবো পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে গেলাম শেষ মাথায়। দেখি স্বোত আসলে দ্বিমুখী। উভয় থেকে আসছে জোয়ারের জল, আব দক্ষিণ থেকে স্বোত। অর্থাৎ যদি আমি দক্ষিণের স্বোতে ভেসে যাই জাহাঙ্গের দিকে, ফিরে আসার সময় উভয়ের স্বোত আমাকে সাহায্য করবে।

কিন্তু আজ আব নয়। বেলা প্রায় শেষ। খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে ঘূমিয়ে পড়লাম। উঠলাম পরদিন ভোর সকালে। স্বোত এসময় তেমন তীব্র হয় না। ভেসে পড়লাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কসরৎ করতে হল খানিকটা। একটু পরেই পৌছে গেলাম জাহাঙ্গের কাছে।

সে যা অবস্থা জাহাঙ্গের! স্পেনের জাহাঙ্গ—নির্মাণ কৌশল দেখলেই সেটা অনুমান করা যায়। গোস্তা থেয়ে এসে পড়েছে পাহাড়ের একটা ফাটলের মাঝখানে, চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে সামনের দিকটা। সে যেন লণ্ডণ ভাব। মাস্তল নেই, হাল ভাঙ্গা, পাটাতন পুরোপুরি



কুলের কাছ বরাবর হতে দেখি একটা মৃতদেহ

জলঘন্টা—মানুষের গন্ধ পেয়েই হোক বা অন্য যে কোনো কারণে হোক, একটা কুকুর দেখি বেরিয়ে এল ভিতর থেকে। আমাকে দেখে সে কী হাঁক ডাক! একলাফে বাঁপিয়ে পড়ল জলে। আহারে বেচারা! কতদিন যে আছে অনাহারে! আমার ডোঙায় এসে উঠল। দিলাম কটা রুটি। চোখের নিষেষে শেষ। জল দিলাম এক পাত্র, খেল গপগপ করে। যেন কুকুর নয়, একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে। সেই রকমই ভাব। ওকে ডোঙায় সেই অবস্থায় রেখে আমি জাহাঙ্গে এসে উঠলাম।

জীবনের সাড়া শব্দ নেই। জল টেলতে টেলতে চলেছি এগিয়ে। দেখি রান্নাঘরের সামনে দুটি মৃতদেহ। ফুলে গেছে, দুজনের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধা। এরা পাচক। হ্যাত জল দুকছে দেখে দুজনে দিশা ঠিক করতে না পেরে বেঁধে ফেলেছিল হাত, হ্যাত বন্ধ ছিল দুজন, একসাথে মরবে সংকল্প করেছিল। একসাথেই মরেছে। এগিয়ে গেলাম। মন্ত্র একটা পেটি, তাতে থরে থরে ঘদের বোতল। ভীষণ ভারী। কটা প্যাটারাও নজরে পড়ল।

নাবিকদের জিনিসপত্ররাখার বাক্স। দুটো দেখলাম ঘোটের উপর হালকা। তুলে এনে
রাখলাম ডোঁওয়।

মনটা ভারি খারাপ লাগছে। পারলাম না এতটুকু সাহায্য করতে। বিপদে পড়েছিল
এরা। পেল না আগ। আর যা ভগ্নদশা জাহাজের! সেটাও আমার মন খারাপের অন্যতম
কারণ। সামনের দিকটা ঐভাবে না ভেঙে যদি অন্য কোনো রকম জখম হত—যদি ভাঙ্গত
মাস্তুল কি হাল কিংবা পাটাতন—একবার নয় জোড়াতালি দিয়ে চেষ্টা করতাম ভেসে
পড়ার। জাহাজে আসার সেটাও একটা প্রধান কারণ। চাই যে আমি এখান থেকে এবার
সরে পড়তে। এটা আমার ঐকান্তিক বাসনা। যত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায় ততই মঙ্গল।
নরখাদকের হাতে থাণ দেবার চাইতে তো ভালো; ভেসে পড়তাম সাগরে। যেখানে খুশি
নিয়ে যাক হাওয়া, স্বোত তোলপাড় করুক, চাই কি ভুবে যাই অতলান্ত জলে—আমার
জঙ্গে মাত্র নেই। আর ভালো লাগছে না এই একক জীবন। আমি এবার মুক্তি চাই।

একটা ছোটো পেটি পেলাম মদের বোতলের। সেটা নিলাম। কটা বন্দুকও রয়েছে
একটা ঘরে। নিলাম বন্দুক। শুকনো বারুদ রয়েছে যৎসামান্য—চার পাউণ্ড মাত্র ওজন।
নিলাম। একটা বেলচা পেলাম, আর একটা চিমটে। দুটো পেতলের কেতলিও রয়েছে,
ফেলে রেখে লাভ কী। জল গরম করতে বা দুধ জ্বাল দিতে আমার তো কেতলির খুব
দরকার। নিলাম। আর দেখি চকোলেট বানাবার তামার একটা ডেকচি মতো। সেটাও সঙ্গে
নিলাম।

মোটমাট সব মিলিয়ে এই। আর কুকুর। তার কথা তো আগেই বলেছি। আর নেবার
মতো কিছু নেই জাহাজে। সঙ্গের ঘোর লেগেছে তখন। স্বোতের টানও কম। ভাসিয়ে
দিলাম ডোঁও। দ্বীপে ফিরে এলাম যখন, প্রায় মাঝরাত। আর ভারি ক্লান্ত আমি। ভীষণ
ঘূম পাচ্ছে।

সে রাতে আর গেলাম না গৃহায়। ডোঁওতেই থাকব। মালপত্র পুরানো গৃহাতে নিয়ে
যাব না। এটা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছি। নতুন আবিষ্কার করেছি সেই যে অস্তুত
গৃহ—রাখব সব সেখানে উইঁ করে। এগুলো আমার অভাবের দিনের সঞ্চয়। শুধু একটা
কেটলি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর প্যাটেরিয় যদি কিছু পোশাক থাকে তার দু একটা।
সেই মন নিয়েই পরদিন ভোরে ডোঁও নিয়ে এলাম নতুন গৃহার কাছে। মাল তুললাম।
দেখে মনে হয় না পানীয় হিসেবে খুব একটা ভালো। তবু মদ তো। সময়ে যথেষ্ট কাজ
দেয়। দেখি ছেট্ট একটা কাগজের প্যাকেট, তাতে বোতলে বোতলে ভরা খনিজ জল।
ভীষণ উপকারী। এতে নানান অসুব সারে। আর একটা মোড়কে কিছু মেঠাই। এত সুন্দর
করে বাঁধা যে ভিতরে এক ফেঁটা জল ঢুকতে পারে নি। খেলাম দুটো। আহ কী অপূর্ব যে
খেতে!

আরো কটা মোড়ক আছে, কিন্তু তার অবস্থা শোচনীয়। জল ঢুকেছে ভিতরে। ফেলে
দিলাম। বেশ কয়েকটা জামাও আছে। আর বিস্তর রুমাল। দুটোই আমার কাছে
লোভনীয়। গরবের দিনে এমন ঘাম হয় চোখে ঘুঁষে, ন্যাকড়ার অভাবে পারি না মুছতে।
এখন থেকে রুমাল ব্যবহার করব। আর পাঠক তো জানেনই, জামা পরার পাট আমার
কবে চুকে গেছে। ছাগলের চমড়াই এখন আমার একমাত্র পরিধেয়। সুতরাং জামায় যে
লোভ পড়লে এতে আর আশ্চর্য কি। দেখি উপরের দিকে একটা গোপন খোপ। তাতে
বিস্তর নোট—প্রায় এগারশুর মতো আর ছটা সোনার গিনি, সোনার পাতও আছে সামান্য।
সব মিলে ওজন প্রায় এক পাউণ্ডের মতো।

ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗରେ ବେଶିର ଭାଗରେ ପୋଶାକ ଆଶାକ । ତବେ ସୁବେଳ ଏକଟା ଦାମୀ ନୟ । ଆର ଦେଖି କିଛୁ ବାରନ୍ଦ । ଦୁଟୋ ମୋଟ ପ୍ରୟାକେଟ । ଏଟା ନିର୍ଧାର କୋନୋ ଶିକାରିର ବାକ୍ର । ଏବାରକାର ଅଭିଯାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ବଲତେ ଏହି । ଆମାର ପ୍ରୟୋଜନେର ତୁଳନାଯ ଯେସାମାନ୍ୟ । ଆପନାରା ହୃଦୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସୋନା ବା ଅର୍ଥେର କଥା ବଲବେନ । କିନ୍ତୁ ସତି ବଲତେ କି ସୋନା ଆର ଆମାର ପାଯେର ନିଚେର ଧୂଲୋର ମଧ୍ୟେ ଆମି କୋନୋ ତଫାର ଦେଖତେ ପାଇ ନା । କି ଲାଭ ଆମାର ସୋନା ଦିଯେ ! ଆମି କି ଗୟନା ଗାଁଟି ଗଡ଼ାବ ନା ବିକ୍ରି କରେ ରାଜା ବାଦଶାର ମତୋ ଧରୀ ହବ ? କାର କାହେ କରବ ବିକ୍ରି ? ତବେ ହ୍ୟା, ବଲତେ ଭୁଲ ଗେଛ—ଜୁତୋ ପେଯେଛି ମୋଟ ଚାର ଜୋଡ଼ା । ଏଟା ଆମାର କାହେ ଏକଟା ବିରାଟ ବ୍ୟପାର । ଦୁ ଜୋଡ଼ା ପେଯେଛି ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ, ଆର ଦୁ ଜୋଡ଼ା ସୁଲେ ନିଯେଛି ମେହି ହାତ ବୀଧା ଦୁଇ ମୃତ୍ୟୁର ପା ଥେକେ । ଆମାର ସୁବେଳ କାଜେ ଲାଗବେ । ଖାଲି ପାଯେ ଇଟିତେ ଇଟିତେ ପାଯେର ଯା ଦୂରବସ୍ଥା । ତବେ ଏହି ଯା ଜୁତା—ସୁବେଳ ଏକଟା ଟେକସଇ ହବେ ବଲେ ମନେ ହୁଏ ନା । ରବାରେର ତୈରି । ତବୁ ଯାହୋକ, କିଛୁଦିନ ତୋ ପାଯେର ଏକଟୁ ଆରାମ ହୁବେ ।

ତାଇ ବଲେ ଟାଙ୍କା ବା ସୋନା କିନ୍ତୁ ଫେଲିଲାମ ନା ବା ଅବହେଲା ଭରେ ଯତ୍ରତ୍ର ରେଖେ ଦିଲାମ ନା । ନିଯେ ଗେଲାମ ସାଥେ କରେ ଆମି ଯେ ଗୁହାୟ ଥାକି ମେଖାନେ, ଆଗେକାର ଜାହାଜ ଥେକେ ଆନା ଟାକାକଡ଼ି ଯେଥାନେ ମଞ୍ଜୁତ ରେଖେଛିଲାମ ତାରଇ ସାଥେ ରେଖେ ଦିଲାମ ଗୋଛ କରେ । ତା ସବ ମିଲିଯେ ନେହାର କମ ନୟ । କାଜେ ଲାଗତେ ପାରେ ହୃଦୟ କଥନେ । ଯଦି ଇଂଲ୍ୟାନ୍ଡେ ଯାବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ, ଅର୍ଥାର ଯଦି ପାରି କୋନୋକ୍ରମେ କୋନୋ ଜାହାଜେର ସଙ୍ଗେ ବଦ୍ଦୋବସ୍ତ କରତେ, ତବେ ପାରାନିର କଡ଼ି ହିସେବେଓ ତୋ କିଛୁ ଦିତେ ଲାଗବେ ।

ଅଭିଷ୍ଠତା ଥେକେ ବଲଛି, ବିଶେଷ କରେ ଛେଲେ ଛୋକଡ଼ାଦେର—ଯାଦେର କମ ବ୍ୟେସ, ଯାଦେର ରକ୍ତ ଚକ୍ରଲ—ଦେଖୁନ, ଭାଇ, ଆପନାରା ଅସହିଷ୍ଣୁ ହବେନ ନା । ଟ୍ରେନରେ ଦେଓୟା ଯେ ଦାନ ତାଇ ନିଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାକତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ । ତବେ ଶାନ୍ତି ପାବେନ । ଆଖେରେ ମେଓୟା ଫଳବେ ।

ଏବାର ଘଟନାଯ ଫିରେ ଆସି ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସେଟା । ଆମାର ଦ୍ଵୀପେ ଅବସ୍ଥାନେର ଚବିବିଶ ବଛର । ଆନ୍ତାନା ଥେକେ ବିଶେଷ ଏକଟା ବେରଇ ନା । ଦରକାର ପଡ଼େ ନା ତାଇ । ମୋଟାମୁଟି ଶରୀରେର ଦିକ ଥେକେ ସୁନ୍ଦର ଆଛି । ଖାଓୟା ସୁମ ବିଶ୍ରାମ କୋନୋ କିଛୁରଇ ଅଭାବ ନେଇ । ଉତ୍ତରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଆହେ ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚୁର । ରାତ ହେଁବେ । ସୁମୋବ ବଲେ ଶୁଯେଛି ଏସେ ବିଛନାଯ । ସେଦିନ ଅନ୍ତୁତ କାଣୁ—ସୁମ ଆର କିଛୁତେଇ ଆସେ ନା ।

ଏକେର ପର ଏକ ଚିନ୍ତା ଯେ ତୋଲପାଡ଼ ହଚେ ମନ । ଜାନି ନା କେନ—ମନେ ପଡ଼ିଛେ ନିଜେର ଜୀବନେର ପୁରାନୋ ଦିନେର କଥା । ମେହି ଆମାର ଛେଲେବେଳା, ବାବାର ଉପଦେଶ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ଭେସେ ପଡ଼ା, ତାରପର ଦୁର୍ଭେଗ, ଫେର ଅଭିଯାନ—ଛୁବିର ମତୋ ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଭେସେ ଉଠିଛେ ଆମାର ମନେର ପର୍ଦୀଯ । ଦ୍ଵୀପେ ଆସା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରତିଟି ସୁଚିନାଟି ଘଟନାଓ ମନେ ପଡ଼ିଛେ । ବେଶ ତୋ ଚଲଛିଲ ଜୀବନ ପ୍ରବାହ—ହଠାତ ଯେ କେନ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ ପାଯେର ଛାପ । ମେହି ଥେକେ ତୋ ଗୋଟା ଛବିଟାଇ ପାଲଟେ ଗେଲ । ତବେ ନା ନରଖାଦକ ସମ୍ବନ୍ଧକେ ଧାରଣା ଜ୍ଞାଲ । ଆଗେଓ ହୃଦୟ ଏସେହେ ଅନେକବାର, ଆମାର ଚୋଥେ ପଡ଼େ ନି । ବା କୋନୋ ନଜିରଓ ଦେଖତେ ପାଇ ନି । ହୃଦୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରେ ଆସା ଯାଓୟା ଚଲଛେ । ହିଂସର ନିଷ୍ଠାର ଲାଲସା ଚରିତାର୍ଥ କରାର ଏର ଚୟେ ଭାଲୋ ଜାଯଗା ଆର କୋଥାଯ ଆହେ । ହୃଦୟ କଥନେ ଶଯେ ଶଯେ ଏସେହେ ଦଲ ବେଧେ । ଆମାର ଅଞ୍ଜାତସାରେ । ଏଲେଇ ବା କୀ ଆସେ ଯାଯ । ଆମାକେ ବ୍ୟାତିବ୍ୟାନ୍ତ ନା କରଲେଇ ହଲ । ଆମି ତୋ ଆର ଉପଯାଚକ ହୁଁ ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ଲଡ଼ାଇ କରତେ ଯାଇଁ ନା । ତାତେ ଲାଭେର ଚୟେ ଲୋକସାନଇ ବେଶ । କୀ ଦରକାର ବାପୁ ଖାଲ କେଟେ କୁମୀର ଡେକେ ଆନାର ।

ଆୟ ଦୁଷ୍ଟା ଧରେ ସମାନେ ଏଇସବ ତାଲଗୋଲ ଚିନ୍ତା । ମାଥା ଗରମ ହୁଁ ଗେଛେ ତଥନ

আমার। সারা শরীরের রক্ত যেন উঠে এসেছে মাথায়। খুব ক্লান্ত লাগছে। ভাবনা চিন্তাতেও ক্লান্তি আসে না কি? বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত ভাব তখন আমার। চোখের পাতা আপনা আপনি বুজে এল। কখন ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না। স্বপ্ন দেখলাম। যেন বেরিয়েছি আমি রোজ্জুকার নিয়ম মতো বন্দুক কাঁধে সকালবেলা। হঠাৎ কূলের দিকে দৃষ্টি যেতে দেখি দু দুটো নৌকা। এগারজন মোট তাতে। নামল তারা। সঙ্গে এক বন্দী। সে-ও তাদেরই মতো একজন। তাকে এনেছে খাবে বলে। তাকেও নৌকা থেকে নামানো হল কূলে। মৃহূর্তে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে যা তাজ্জব ব্যাপার! বন্দী তো পড়ি কি মরি করে লাগিয়েছে বাই বাই ছুট। আসছে আমারই আস্তানার দিকে। এসে বোপঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আমি তো সবই দেখতে পাচ্ছি। তখন বেরলাম আমার গোপন জায়গা থেকে। দেখা দিলাম। হাসলাম মুচকি মুচকি। তখন আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল, হাত জোড় করে আমাকে ইঙ্গিতে অনুরোধ করল তার জীবন রক্ষা করতে। আমি তখন ইশারায় মহাঁটা দেখিয়ে দিলাম। উঠে এল তরতরিয়ে। ব্যস, তারপর আর কি, সে থেকে সে আমারই সাথে আমার অনুগত সহচরের মতো। আমার আনন্দ আর দেখে কে। আর আমার কীসের চিন্তা। খুঁজছিলাম বহুদিন ধরে এরকমই একজন সহচর। এরই সাহায্যে এবার এখান থেকে পালাব। মুক্তি পাব। মুক্তির আনন্দে সে এমনই টালমাটাল অবস্থা যে এক ঝটকায় ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি ঘুরঘুটি অঙ্ককার। আমি বিছানায় শোয়া। ঘোমছি দরদর করে। কোথায় আমার সেই সহচর! তখন দুঃখে হতাশায় সে যা মনের অবস্থা আমার!

সে যাই হোক চেতনে হোক বা অবচেতনে হোক, ঘুমের মধ্যে অন্তুত এক শিক্ষা লাভ হল। এখান থেকে পালাবার জন্যে যে আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি, সেটা আমার একলার চেষ্টায় সম্ভব হবে না। আর একটা লোক অস্তত চাই: বিশেষত বর্বর সম্প্রদায়ের। সমুদ্রের হালচাল আমার চেয়ে ওরা দের দের ভালো বোঝে। জায়গাটাও পরিচিত। কিন্তু সে না হয় পরের কথা। আগে লোকটাকে জ্ঞাটাই কী করে?

ভেবে দেখলাম, একটি মাত্র উপায় আছে এবং এক্ষেত্রে নরবাদকের দল আমার ভরসা। ওরা দ্বীপে আসবে বন্দী নিয়ে; সেই সুযোগে আমি ওদের সব কটাকে মারব। শুধু বন্দীকে রাখব অক্ষত। সেই হবে আমার সহচর। কিন্তু ভাবনা যত সোজা কাজটা কি তত সোজা? যদি একচুল হিসেবে গোলমাল হয়ে যায়! তাছাড়া ন্যায় অন্যায়ের প্রশঁস্তাও আছে। আমি যে ওদের মারব, ওরা তো আমার সোথে কোনো অন্যায় আচরণ করে নি। সেক্ষেত্রে সিদ্ধরের নির্দেশের বাইরে হবে সেই কাজ। হোক, তবুও মারব। এছাড়া আমার আর উপায় নেই। একটু ঘুরিয়ে চিন্তা করলে এও তো প্রয়োজনে হত্যা। আমার পালানো দরকার তাই প্রাণ হরণ। তাতে পাপ কোথায়! বরং আমি যে একজন মৃত্যু পথ্যাত্মী বন্দীকে রক্ষা করছি সেটা তো আমার অশেষ পুণ্য। পুণ্যের ভাগটাই এক্ষেত্রে বেশি। সুতরাং এই নিয়ে আর বিভীষণ কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না।

মোটামুটি মনস্তির করার পর কৌশলের প্রশ্নটা মাথায় এল। অর্ধাং কী কৌশলে আমি ওদের হত্যা করব। বিস্তর ভেবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম যে এই মৃহূর্তে সেটা ভাববার চেষ্টাও ব্রথা। কেননা কখন কী অবস্থায় থাকবে ওরা সেটা তো আগে থেকে আমার জানা নেই। তাই আগে ভাগে কোনো ফন্দী বার করবারও কোনো অর্থ হয় না। বরং আসুক আগে, তখন নয় হিসেব নিকেশ করে দেখা যাবে কোন উপায়টা কার্যকরী এবং সেই মতো ব্যবস্থাই গ্রহণ করব।

ডেঁড়া নিয়ে ফিরে এলাম সেই গোপন বন্দরে। অর্থাৎ পাহাড়ের সেই খাজ। লুকিয়ে ফেললাম আগের মতো। অর্ধেক জল বোঝাই অবস্থায় ডুবে রাইল জলের মধ্যে। বাইরে থেকে দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। তারপর ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়। দেখি সব রয়েছে আগের মতো। হাত দেয় নি কেউ বা ফেলে নি কি ছড়ায় নি। সেটা সুখের কথা। অর্থাৎ আমার আস্তানা কোনো ভিন্ন মানুষের চোখে ধরা পড়ে নি। এদিকে মনটাও বেশ প্রফুল্ল। তবু যাহোক নতুন একজন সাথী তো পেয়েছি—সেই কুকুর। পাহারাদারীর কাজটা ওর সাধ্যমেও চলবে। বিশেষ করে নরখাদকের দল কাছাকাছি এলে ইকডাক করে জানান দেবে। খানিকটা নিশ্চিন্ত বল্যা যায়।

কেটে গেল এইভাবে আরো দুটিবছর। আর এই দু বছরে কত যে পরিকল্পনা আমার! মাথাটাই যে গোলমেলে। সুযোগ পেলেই এটা ওটা ভাবতে শুরু করে। অস্তু শখানেক মতলব এল এই দ্বীপ থেকে পালাবার। শ খানেকই বাতিল হল। একবার ভাবলাম, লেগে পড়ি ঐ ভাঙা জাহাজ সারাবার কাজে। যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তৈরি অন্তি হলাম। শেষে নির্বর্থক প্রচেষ্টা এই ভেবে যাওয়া আর হয়ে উঠল না।

বলতে পারেন এ আমার স্বভাবের অঙ্গুত এক বৈশিষ্ট্য। কিছুতে পারি না সুস্থির হয়ে নিজের অবস্থার মধ্যে তস্য থাকতে। ছোটোবেলা থেকে উড়ু উড়ু যে মন। তাই না জীবনে কত কষ্ট পেলাম। শুনতাম যদি বাবার আদেশ। বা ব্রাজিলে যদি সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে নিজের ক্ষেত খামার নিয়ে বিচে বর্তে থাকবার চেষ্টা করতাম। কত টাকার মালিক হতাম এত দিনে, কত সম্মান কত যশ। সব গেল তচ্ছচ্ছ হয়ে। আবার এই যে এখানে রয়েছি মোটের উপর সুস্থ ভাবে, এটাও আজকাল আর ভালোলাগে না। কেবল উড়ু উড়ু করে মন। তাই না যত অশাস্তি!

শুরু হল প্রতীক্ষার পালা। হায় রে, কী আমার ভাগ্যের পরিহাস—দেড়টা বছর পার হতে চলল, বারেকের জন্যও পাই না ওদের দেখা। গেল কোথায় সব! না কি মানুষের মাংস খাওয়া বন্ধ করে সন্ধ্যাসি হল। ভেবে দেখুন আমার মনের অবস্থা। ধুঁটি সাজিয়ে আমি এদিকে তৈরি, অথচ বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের এখনো দেখা নেই।

তাই বলে দমিনি কিন্ত এতটুকু। আগছে আমার এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি। রোজ নিয়ম করে পাহাড়ের মাথায় উঠে চারদিকে নজর বোলাই। খুঁটিয়ে কুঁটিয়ে দেখি আশপাশ। আর বোজহই আশা করি, আজ তো আর এল না, কাল আসবে। কিন্ত সেই কাল আর আসে না।

এমনি ভাবেই টানা দেড় বছর। মাসের হিসেবে আঠারটা মাস। হতাশার বীজ একটু একটু করে মনে জন্ম নিছে। সেই মন নিয়েই উঠেছি একদিন ভোববেলা। রোজকার অভ্যেস মতো কূলের দিকে তাকিয়েছি। দেখি, অবাক কাণু; একটা নয় দুটো নয়, একসাথে একবারে পাঁচ পাঁচখানা নৌকো। আর প্রচুর মানুষ। সবাই দুদাঢ় করে কূলে নাঘল। আমি যে ভালো করে একটু দেখব সে অবকাশটুকুও পেলায় না। চলে গেল সবাই আঘাত চোখের আড়ালে এক গাছের ছায়ায়।

তখন তড়িঘড়ি পাহাড়ের মাথায় গিয়ে উঠলাম। হাতে দূরবীন। আর যতদূর সম্ভব নিজেকে রেখেছি লুকিয়ে। শুয়ে পড়লাম স্টান পাথরের উপর। পায়ের কাছে বন্দুক জড় করে রাখা। সব নিয়েই এসেছি উপরে। হয় এসপার নয় ওসপার। কিন্ত সবার আগে পর্যবেক্ষণটা দরকার।

দেখি ত্রিশজন মোট। আগুন জ্বলে বসেছে গোল হয়ে। মাংস কাটাকুঠি চলছে। রান্না

কীভাবে শেষ অঙ্গি হল আমি দেখতে পেলাম না। একটু পরে দেখি নাচতে শুরু করেছে সবাই। সে কী উদ্বাধ উদ্বাধ নাচ! কত যে তার অঙ্গভঙ্গি! দেখতে দেখতে গা আমার শিউরে উঠল।

হঠাৎ দেখি দুই বন্দীকে ওরা নৌকো থেকে টেনে নামাছে। দূরবীনে আমি স্পষ্ট তাদের দেখতে পেলাম। আহারে কী করণ কী দৃঢ়ী মুখ! একজনকে নামিয়েই সঙ্গে সঙ্গে কাঠের মুগুর দিয়ে ঘারল মাথায়। পড়ল সে বালির উপর মুখ খুবড়ে। তখন নিয়ে গেল তাকে চ্যাংডোলা করে আগুনের কাছে। কাঠের তলোয়ার দিয়ে শুরু হল তাকে কাটাকুটির পালা। অপর বন্দীটি কিন্তু তখনে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত দেখছে তার সঙ্গীর নিষ্ঠুর পরিণতির দশ্য। ভাবছে নিজের আশু অবস্থার কথা। একবার ওরই মধ্যে চোখ তুলে চারধারে কী যেন জরিপ করল। পরক্ষণেই দেখি বাই বাই করে সে যা তার ছুট! বলব কি এমন ক্ষিপ্র গতিতে যে কোনো মানুষ ছুটতে পারে আমার ধারণার বাইরে। হরিশের চেয়েও দ্রুততর সেই গতি। আসছে আমারই আস্তানার দিকে। সঙ্গীদলেরও খেয়াল গেছে ততক্ষণে। তাদের মধ্যে তিনজন তাকে ধরবে বলে পিছনে ছুটছে। কিন্তু পারে কি ধরতে। অমন গতি কি আছে তাদের পায়ে। আমি তো হতভম্ব। তবে কি সত্যি হতে চলছে আমার স্বপ্ন? কল্পনা কি বাস্তবের রূপ ধরতে চলেছে? অস্ত্রশস্ত্র আমার হাতের কাছেই মজুত। সব সমেত পাহাড়ের গা ঘসটে ঘসটে অনেকটা নিচে নেমে এলাম। লুকিয়েছি এবার একটা মন্ত গাছের আড়ালে। ডালপালায় এমনই ঢাকা সহসা কেউ টের পাবে না আমার অস্তিত্ব; দূরবীন চোখে দেবার আর দরকার নেই। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব। চারটি প্রাণী দিশেহারা হয়ে উদ্বাদের মতো ছুটছে।

মাঝে ছোটো একটা নালা। ওপাশে জমি। এপাশে একটু এগিয়ে আমার আস্তানার দেয়াল। নালা বলতে সেই নদীটারই অংশ, যার বুকে তেলা ভাসিয়ে আমি জাহাজ থেকে আনা প্রথম ঘালপত্র তুলেছিলাম এই দ্বাপে। বন্দী মানুষটি ছুটতে ছুটতে এসে অসীম ক্ষিপ্রতায় ঝাপিয়ে পড়ল সেই জলে। তারপর সাতার কাটতে লাগল। অনুসরণকারীদের একজন এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নালার মুখে। হয়ত সাতার সে জানে না। বাকি দুজন মরিয়ার মতো ঝাপ খেয়ে পড়ল জলে। সাতার কাটতে লাগল উদ্বাম বেগে। প্রথমজন আর একটু দাঁড়িয়ে থেকে যে পথে এসেছিল, সেই পথে ফিরে গেল। সেটা বন্দীর পক্ষে মঙ্গল। আমি দৃষ্টি ফিরিয়ে তিনজনকে লক্ষ করতে লাগলাম।

দুজন তখনো সাতার কাটছে, বন্দী জল থেকে উঠে এসেছে ডাঙায়। ছুটছে। সামনে আমার দেয়াল। থমকে দাঁড়াল। এই আমার সুযোগ। অস্ত্র আমার হাতের গোড়ায় মজুত। তবে কি দীর্ঘবাই জুটিয়ে দিলেন আমার সহচর? সুযোগের সম্বুদ্ধের করতে হবে। তখন মুখের কাছে হাত জড়ে করে ডাকলাম। সে চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। খুব ঘাবড়ে গেছে। তখন ডাকলাম হাতের ইশারায়। দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। তখন এক লাফে নিচে নামলাম। নালার একেবারে কাছে। অনুসরণকারীদের একজন তখন সবে জল থেকে উঠেছে। গুলি করলাম তার বুক লক্ষ্য করে। শব্দ হল। কিন্তু এমন নয় যে বিরাট একটা অওয়াজ। কুলের কাছে যারা আছে তারা শুনতে পাবে না। গুলি খেয়ে পড়ে গেল সে উপুড় হয়ে। দ্বিতীয় জন থমকে দাঁড়িয়েছে তখন। ডাঙায় এক পা। কাঁধে তীর ধনুক। হয়ত আঁচ করে থাকবে ঘটনাটা। আমাকে দেখতে পেয়েছে। ধনুকে তীর যোজনকরে আমার দিকে তাক করল। মারলাম বন্দুকের বাঁট দিয়ে এক ঘা। পড়ল ছিটকে। হাত থেকে তীর ধনুক পড়ে গেল। ঘুরে দেখি বন্দী চোখ বড় বড় করে দেখছে আমাকে। তখন ফের তাকে

ডাকলাম। কাছে আসতে বললাম। এল শুটি শুটি। খানিকদূর এগিয়ে থমকে দাঢ়াল। আবার ডাকলাম। আবার কয়েক পা এগিয়ে এল। দেখি থরতর করে কাঁপছে। ইশারায় বুঝিয়ে দিলাম ভয়ের কোনো কারণ নেই। তখন হাঁটু গেড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাটিতে বসল। অর্থাৎ শুন্দা জ্ঞাপন। আমে যে রক্ষাকর্তা ওর! হাসলাম তখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে। এগিয়ে আসতে বললাম। এল আরো একটু। মাথা নিচু করে মাটিতে ঠেকাল। সটান শুয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরল আমার পা। একখানা পা তুলে নিয়ে মাথার উপর রাখল। এটা বর্ষের সম্প্রদায়ের রীতি, আমি জানি। অর্থাৎ আমাকে প্রভু বলে মেনে নিল। তখন হাত ধরে তুললাম। বন্দুকের ঘা মেরে ঘাকে ঘায়েল করেছি, তাকে দেখিয়ে দিলাম, ইশারায়! আকারে ইঙ্গিতে বললাম, ও মরে নি। ওর একটা গতি কর। কী যেন বলল তখন বিড়বিড় করে। এক বর্ণও আমার মাথায় চুকল না। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর এই শুনলাম প্রথম মানুষের কষ্টস্বর। তখন আমার কোমরের তরবারি কূলে তার হাতে



বারবার মুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো তরোয়ালখানা

দিলাম। অমনি তরবারি হাতে ছুটে গেল ক্ষিপ্র গতিতে। এক কোপে কেটে ফেলল তার মাথা। আমি তো থ। জার্মানির এমন কোনো জল্লাদ নেই যে পারবে এইভাবে এক কোপে মাথা কেটে নামাতে। আর যুব সম্ভবত নিজের কাজে নিজেও হয়ে গেছে আবাক। বারবার মুরিয়ে দেখতে লাগল তলোয়ারখানা। রক্ত মুছে আমার হাতে এনে দিল। আর কী হাসি তখন মুখে! ভীষণ খুশির ভাব। কত কী যে বলল তারপর। আমি এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

ভারি অবাক হয়ে গেছে আমার বন্দুকের ব্যবহার দেখে। দেখে নি তো আগে কোনোদিন। দূর থেকে কি এমন কারিকুরি করলাম যে ছুতে হল না, একটা ঘা অন্তি দেবার দরবার হল না, অর্থচ লোকটা পড়ে ঘারা গেল! আমাকে ইশারায় জিজ্ঞেস করল, যাব ওর কাছে? বললাম, যাও না, গিয়ে দেবে এস। তখন গেল কাছে। চিৎ করে দিল তার দেহ। ঠিক বুকের মাঝখানে গুলির ফুটো। তা দিয়ে তখনো রক্ত পড়ছে চুইয়ে চুইয়ে। দেখল তাঁটি অবাক চোখে অনেকক্ষণ। আমি ডাকলাম। তখন মৃত ব্যক্তির তীর ধনুক নিয়ে

মন্ত্র মুঘের ঘতো আমার পেছন পেছন আসতে লাগল।

কিন্তু না, মড়া দুটো এভাবে ফেলে যাওয়া ঠিক না। যদি বাকি দলবল এসে দেখে তাহলে আমার আস্তানার হাদিশ পেয়ে যাবে। তাকে বোঝালাম সে কথা। তখন বলল মাটি খুড়ে পুঁতে রেখে যাবে। আমি তাই করতে বললাম। তখন ক্রত মাটি খোড়ার কাজে লেগে পড়ল। কী অসীম ক্ষিপ্ততা তার হাতে! শুধু যে হাত দিয়ে অত অল্প সময়ের মধ্যে দু দুটো মন্ত গর্ত খোড়া যায় আমার ধারণারও বাইরে। প্রমাণ আকারে হতে দেহ দুটো নামিয়ে দিল গর্তে, মাটি চাপা দিল। সময় লাগল বড় জোর আধ ঘণ্টা। তখন নিশ্চিন্ত মনে চললাম আমার বাড়ির দিকে।

মই ডিঙিয়ে দেয়ালের এধারে আনলাম। দেখে সে তো অবাক। তখন রাটি দিলাম খেতে, আর জল। খেল গোগ্রাসে। আহারে, কবে থেকে হয়ত খায় নি একফোটা কিছু! তার উপর মরণপথ এই দৌড়। যাওয়া দাওয়ার পর একটু সুস্থ লাগছে দেখতে। বললাম, শোও এবার, সুমোও। বলে পাঁজা করা একধারে ছিল খড়, তার উপর দিলাম একটা কম্বল বিছিয়ে। শুয়ে পড়ল অনুগত ভ্রত্যের মতো। তারপর মুহূর্তের মধ্যে সে যাকে বলে গভীর ঘূম।

দেখছি আমি তখন তাকে। সুঠাম সুন্দর স্বাস্থ্য। মজবুত শরীর। পা দুখানি দীর্ঘ এবং চমৎকার গড়নের। বয়েস কত আর হবে, খুব বেশি হলে ছাবিশ : মুখ চোখের ভাবও ভারি মিষ্টি। উপ্রতা নেই। কোঢল কমনীয় ভাব। আর হাসিটুকু খুব সুন্দর। মাথায় লম্বা কালো কুচকুচে চুল। কেঁকড়ানো নয়। উন্নত কপাল। চোখে বুদ্ধিদীপ্ততার ছাপ। গায়ের ঝং ঠিক কালো নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলতে যা বোঝায় তাই। ছোটো নাক। মুখখানি গোলাকার। নিশ্চেদের ঘতো টেটিও পুরু নয়, পাঁচল। সুন্দর ঝকঝকে দু পাটি দাত। তা আধুনিক পরেই দেখি ঘূম ভেঙে উঠে বসেছে ধড়মড়িয়ে। আমি তখন দুধ দোয়াবার কাজে ব্যস্ত। অঘনি শুয়ে পড়ল মাটিতে উপুড় হয়ে, আমার পা তুলে মাথার উপর নিল। আবারও একদফা হাত পা নেড়ে আমার প্রতি যে অসীম কৃতজ্ঞ তাই বোঝাবার পালা। তখন উঠে বসতে বললাম। দুধ দোয়ানো শেষ। বসলাম দুজন মুখোমুখি। প্রথম ক্যাজ আমার তাকে কথা শেখানো। অর্থাৎ আমার ভাষা। নইলে তো কেউ বুঝবে না কারো মনের ভাব। তারও আগে দরকার ওর একটা নাম। কিন্তু কী নাম দিই। তখন খনে এল বারটার কথা। আজ তো শুক্রবার। ইংরিজিতে বলে ফ্রাইডে। হোক না ওর নাম তাই। অর্থাৎ ফ্রাইডে। সেটা বুঝিয়ে দিলাম। দেখি ভারি খুশি। হ্যাঁ আর না বলতে শ্রেণালাম। শিখে নিল চটপট। বুঝিতে ভারি তুখোড়। দুধ দিলাম থেতে। সঙ্গে রুটি। খেল ঢকচক করে। আরো খুশি তখন। বুঝিয়ে দিল, ভারি ত্রুপি পেয়েছে।

রাতটা দুজনে গুহার মধ্যে কাটালাম। দিনের আলো ফুটল। ঘূম থেকে তুললাম। উদোম ন্যাহটো একদম। একটা কিছু পরনের দরকার। দিলাম একটা প্যান্ট। আমার দ্বিতীয় জাহাজ থেকে প্রাপ্তি। বাইরে এলাম। দেখি কাল যেখানে পুঁতেছে দুটো মৃতদেহ সেইদিকেই নজর ওর। আমাকে ইশারায় বোঝাল, মাংস খাবে। অর্থাৎ নরমাংসলোভী। ওকে বোঝাতে হবে এটা আমার চরম অপহৃদ। তখন ইশারায় বললাম আমার যেন্না লাগছে। বমি আসছে। বলে বমির ভঙ্গি করলাম। হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম। এল বাধ্য শিশুর ঘতো। নিয়ে গেলাম পাহাড়ের মাথায়। দেখতে বললাম দূরে, কুলের দিকে। কাল যেখানে এসে ওরা নেমেছিল। ফাঁকা সব। কেউ কোথাও নেই। নৌকো বা পানসীর চিহ্নমাত্র নেই। চলে গেছে দলবল। সঙ্গী দুজনকে ফেলে রেখেই।

তবু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারি না। মনে যে উদ্দেশ। দুটো লোককে ঘায়েল করলাম, একজনকে রাখলাম নিজের কাছে, মুখের শিকার ছিনিয়ে নিলাম মুখের গোড়া থেকে—যদি বদলা নেবার কোনো রকম ফল্পী করে। যদি সত্যি সত্যি চলে না গিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকে। সেটাও তো যাচাই করে দেখা দরকার। অনুসন্ধিৎসা যাকে বলে। তখন ফ্রাইডেকে বললাম, চল্ত দেখি আমার সঙ্গে দেখে আসি সরেজমিনে। অর্থাৎ আকারে ইঙ্গিতে বুবিয়ে দিলাম। এখন মনে অন্য রকমের সাহস। একজন তো আর নেই, এখন মোট দুজন। সঙ্গে নিলাম দু দুটো বন্দুক। আর পিস্টল তো আছেই আর সেই তরবারি। একটা বন্দুক দিলাম ফ্রাইডের হাতে। চললাম ইঁটতে ইঁটতে কুলের দিকে। অবশ্যই সর্তক সাবধানে। গিয়ে যা দশ্য ! বীভৎস বললেও এতটুকু অভ্যন্তরি হয় না। স্ত্রীরা এলাকা জুড়ে মৃতদেহের নানান অংশ বিশেষ ছড়ানো। কোথাও মাথা, কোথাও হাত, কোথাও ধড়, কোথাও পা—যিনিনি করে উঠল শরীর। তাকাতে পারছি না। ফ্রাইডে দেখি নির্বিকার। নরমাংসে ওর কেন আমার মতো ঘেঁঘা হবে ! অর্থাৎ যে কোনো কারণেই হোক সঙ্গী দুজন ফিরে না যেতে বা গুলির শব্দ শনে ওরা ভয় পেয়ে গেছে রীতিমতো। সব ফেলে ছেড়ে অমনি তড়িয়ড়ি পালিয়েছে। আধপোড়া অবস্থায় কত যে পড়ে আছে মাংসের টুকরো। ফ্রাইডে আমাকে ইশারায় বলল, নাকি সঙ্গে এনেছিল ওরা চারজন বন্দী। তিনজনকে মেরেছে, সে ছিল চতুর্থ, তাকে আর কায়দা করতে পারে নি। কথাটা যে ঠিক, তার প্রমাণও পেলাম। মোট তিনটে মাথা, পাঁচখানা হাত, চারটে পা আমি স্পষ্ট চোখের সামনেই দেখতে পাইছি। কিন্তু কেন এই হত্যা ? ফ্রাইডে আকারে ইঙ্গিতে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় এই— ক্ষমতার লড়াই হয়েছিল তাদের রাজ্যে। তাতে রাজা হেরে যান। রাজার পক্ষের সকলকে বন্দী করা হয়। সে রাজার পক্ষেরই একজন। নানান জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের হত্যা করা হয়। ভোজের উদ্দেশ্যেই। তার সৌভাগ্য তাকে এই দ্বীপে আনা হয়েছিল। তাই তো সে রক্ষা পেল।

বললাম, সে নয় বুবলাম, আপাতত এ গুলো সাফ করে ফেল দেখি। আমার বমি আসছে। সহ্য করতে পারছি না। বলে শুয়াক তুললাম। তখন বুবাতে পারল। জড়ো করল সব এক জায়গায়। আগুন জ্বালল। দাউ দাউ করে ঝলতে লাগল চিতা। দেখি লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে দিকে। তখন বোঝালাম, আমি কিঞ্চ মোটে পছন্দ করি না নরমাংস ভক্ষণ। আমার সামনে এমন আচরণ আর যেন কখনো না করে। বললাম, তবে কিন্তু ভীষণ রেগে যাব আমি, প্রয়োজনবোধে রাগের মাথায় তাকে হত্যাও করে ফেলতে পারি।

তখন মাথা নাড়ল। পা ছুয়ে প্রতিজ্ঞা করল। বলল, কোনোদিন আর ওসব লোভ দেখাবে না। তখন নিশ্চিন্ত মনে বাড়ির পথ ধরলাম।

রোদের বড় তাপ। দিয়েছি ওকে শুধু পরনের একটা প্যান্ট। তাতে পিঠে তাপ লাগে। কষ্ট হয়। বসলাম ওর জন্যে ছাগলের চামড়ার একটা জ্যাকেট বানাতে। সে যে কী কসরৎ ! তবু গায়ে বেশ মানানসই হল। টুপিও তৈরি করে দিলাম। পরে সে কী ফুর্তি ! কত ভাবে যে দুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বারবার। তবে অস্বস্তি যে বোধ করছে এটা ঘটনা। এতদিনের অনভ্যাসের পর অস্বস্তি তো লাগবেই। তবু লাগছে কিন্তু বেশ। তেহারা তো ভারি চমৎকার। যা পরে তাতেই মানায। এতক্ষণে প্রভূর উপযুক্ত সহচর বলে চিনতে অসুবিধে হয় না।

পরদিন সকাল থেকে লাগলাম কাজে। সবচেয়ে আগে ওর জন্যে একটা আলাদা

থাকবার জায়গা তৈরি করতে হবে। কোথায় করি? গুহা আর তাঁবুর মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। গাড়লাম সেখানে আরেকটা তাঁবু। তাতে দরজাও হল। আমার গুহার সেই আরেকটা দরজা যেদিকে তারই একেবারে গোড়ায়। সে দরজাটা দিলাম ভিতর থেকে খিল দিয়ে আটকে। মনে আমার এখনো সন্দেহ আছে। কতক্ষণ বা দেখলাম মানুষটাকে! কী ওর ঘতলব, কী চায় বলা তো যায় না। তাছাড়া নরমাংস লোতের ব্যাপারটাও পুরোপুরি যায় নি। সেক্ষেত্রে যতদূর সন্তুষ্টি সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। তাইতো আলাদা ব্যবস্থা। ইচ্ছে হলেও ঢুকতে পারবে না আর গুহায়। বিশেষ করে রাত্রে। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে। ও থাকবে বাইরে। আমি মই বেঞ্চে গুহার দরজা টপকে ভিতরে ঢুকে মহিটা নেব সরিয়ে। ব্যস্ত চোকার রাস্তা বক্ষ। বাইরের উচু দরজাটা ছাড়াও ভিতরে ঢুকে মহিটা নেব সরিয়ে। এমনই ব্যবস্থা, প্রথম দরজা ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে কেউ নিচে পড়লে পড়বে সটান কাঠের পাটাতনের উপর। তাতে শব্দ হবে খুব। আমার ঘূম তেজে যাবে।

শোটমাট এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত। হঠাৎ আক্রমণের আর কোনো ভয় নেই। ও থাকবে বাইরে, আমি ভিতরে। নিরাপত্তার অটুট ব্যবস্থা ছাড়াও হাতের গোড়ায় ঝজুত আমার যাবতীয় অন্তর্শস্ত্র। কীসের আর ভয়!

তবে সবই যে অমূলক এটা কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম। ফ্রাইডেকে সন্দেহ করার মতো কিছু নেই। নিপাট ভালোমানুষ বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। তদুপরি অসন্তুষ্টি প্রভৃতি, কৃতজ্ঞ এবং আমার প্রতি প্রচণ্ড পরিমাণে শুন্ধাশীল। জীবন দান করেছি সেটা ওর কাছে মন্তব্য ব্যাপার। ভালবাসে আমাকে হৃদয় দিয়ে। ঠিক যেমন সন্তান ভালবাসে তার পিতা-মাতাকে। জানি না আমার বুঝতে ভুল কিনা, তবে কখনো কখনো মনে হয় আমার জন্যে জীবন দিতেও তার এতটুকু কুঠা নেই।

অবাক হয়ে লক্ষ করি ওর প্রতিটি ভাবভঙ্গি। আর মুগ্ধ বিস্ময়ে মন ভরে ওঠে। কী বলব একে? এ তো ইঁশ্বরেরই করণ। পথিকীর প্রতিটি কোণে সৃষ্টি করেছেন তিনি মানুষ। বিচিত্র তাদের আচার আচরণ, বিচিত্র তাদের অভ্যাস। তবু সবার ঘিল অস্তরে। একই ভালবাসা সবার হৃদয়ে প্রবাহিত। একই সুখ একই দরদ। ভুলকে সকলে মনে করে ভুল, আবার ঠিককে ঠিক বলে শুন্ধা করে। একে উপর্যুক্ত ভাবে ব্যবহার করার মধ্যেই নিহিত থাকে মানব জীবনের বৈশিষ্ট্য। সে শক্তিও তিনিই যুগিয়ে দেন। কখন কী করতে হবে সব নির্দেশ তাঁর কাছ থেকেই আসে। তাই তো অবাক শুন্ধায় ঘারবার মাথা নোয়াই তাঁর উদ্দেশ্যে।

মোটের উপর ফ্রাইডেকে আমি ভীষণ ভালবাসতে শুরু করেছি। কিন্তু বাধা যে একটা দুরস্ত। ভাষা বোঝে না আমার। আমিও বুঝতে পারি না ওর ভাষা। কীভাবে বোঝাব ওকে সব কিছু? তখন ঠিক করলাম, আর কিছু শেখাবার আগে ওকে ভাষাটা শেখাতে হবে। শুরু হল তারই প্রচেষ্টা। অবাক কাণ, ছাত্র হিসেবে অত্যন্ত মেধাবী। যে কোনো জিনিস একবারেই বুঝে নেয়, মনেও রাখতে পারে সব। এ-ও যেন আমার এক নতুন আবিষ্কার। সেই মন নিয়েই একটু একটু করে শেখাতে লাগলাম।

আর একটা জিনিস আশু প্রয়োজন। নরমাংসের বদলে অন্য মাংসেও যে সমান ত্পুর্ণ পাওয়া যায় সেটা ওকে বোঝানো। একদিন তাই সকাল বেলা বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে ও। মারলাম একটা ছোট ছাগল ছানা। বললাম, নে, এটা নিয়ে চল এবার

বাড়িতে।

আসছি ফিরে, হঠাৎ দেখি পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে আছে একটা ছাগল, সঙ্গে তার দুটো বাচ্চা। ফাইডেকে বললাম, দাঁড়া চুপচাপ। দাঁড়াল। তখন গুলি ছুড়ে মারলাম আরেকটা ছানা। সে অবাক। বিস্ময়ে হতভম্ব। কী যে আশ্চর্য ক্ষমতা আমার হয়ত সেটাই মনে মনে ভাবছে। দেখেছে তো একবার। ধারে গেলাম না শরীরে স্পর্শমাত্র করলাম না, শব্দ হল গুড়ুম করে, স্টোন মরে পড়ে গেল একটা মানুষ। এখন আবার পর পর এই দুটো ছাগল ছানা। দেখি কাঁপছে থরথর করে। আর চোখে মুখে মৃক বিহ্বল সেই ভাব। সেই অবস্থাতেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। মাথা নুইয়ে দিল। গা তুলে নিল মাথার উপর। অর্থাৎ বলতে চায়, প্রভু, তোমার অসীম ক্ষমতা। তুমি ইচ্ছে করলে যাকে খুশি বধ করতে পার। আমি তোমার অনুগত সেবক। দোহাই, আমার জীবন নাশ করো না।

তখন হাত ধরে তুললাম, হাসলাম, মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম। বললাম, নিয়ে আয় ওটাকে। ঐ ছাগল ছানা। তারপর বাড়ি চল। তোকে আজ নতুন মাংস খাওয়াব।

বলেই খেয়াল হল, বন্দুকের ব্যবহার সম্বন্ধে ওকে খানিকটা সতেচন করে দেওয়া দরকার। দেখি দূরে বসে আছে মন্ত্র এক বনমোরগ। সিগলের মতো দেখতে। বললাম, দেখ এবার, ঐ পাখিটাকে আমি মাটিতে ফেলব।

বলে টিপ করে ঘোড়া টিপলাম। পড়ল মোরগ মাটিতে। সে তো হতবাক। এত শক্তি এই ঘন্টের! দূরের কাছের যে কোনো জিনিসই এর শিকার! আগুন উগড়ে দেয় মুহূর্মূহু! অসীম শুক্রা তখন সেই বন্দুকের উপর। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে যে কত মিনতি কর অনুনয় বিনয়! আমি তো হেসে কুল পাই না। কিছুতে ঘেঁষতে সাহস পায় না বন্দুকের ধারে কাছে। হোয়া তো দূরের কথা। সুযোগ পেলেই বন্দুককে জানায় নিজের মনের হাজারো আকৃতি। আমি দেখি আর হাসি।

মরে নি তখনো পাখিটা। বললাম, যা নিয়ে আয়। গেল ছুটে। নিয়ে এল। ফিরে গেলাম বাড়িতে। ছাল ছাড়ানো হল ছাগল ছানার। পাখিটার পালক সাফ হল। ঢাঙ্গাম রাখা। সেকাহ বলা যায়, তবে অন্যদিনের মতো নয়। আজ সুসিদ্ধ। ঘন থকথকে ঝোল। দিলাম বাটি ভরে ওর সামনে। আমিও নিলাম। খেয়ে দেখলাম নিজে। সঙ্গে নুন। সে-ও খেল। জীবনে এই প্রথম নুন খাওয়া। সে কী মুখের ভঙ্গি! ভালো যে লাগে নি সেটা আমাকে বার বার নানান ভাবে বোঝাল। তখন নুন ছাড়া আমি এক টুকরো মাংস মুখে নিলাম। ফেলে দিলাম ধূ ধূ করে। ও ভঙ্গি যেমন করেছে তাই করলাম। তখন অল্প একটু খানি তুলে মুখে দিল। সে-ও নিতান্ত অনিষ্টায়। দেখি মাংস খায় গপ গপ করে। তাতে ভূষ্ণি। নুনে রুটি আনতে আমার অনেক দিন সময় লেগেছে।

পরদিন আর সেক্ষণ নয়, ঝলসে খাওয়া হবে মাংস। আগুন ঝাললাম কাঠ কুটো জড় করে। ঝুলিয়ে দিলাম তার ওপরে কালকের মাংসের অবশেষ। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল এই প্রক্রিয়া। দিলাম ওর শাতে এক টুকরো। দেখি ভারি খুশি। সেক্ষণ মাংসের চেয়ে ঝলসানো মাংসেই ওর ভূষ্ণি বেশি। তাতে অবিশ্য আমার কিছু যায় আসে না। আমার যাবতীয় প্রচেষ্টার মূলে ওর মাংস খাওয়ার প্রচলিত অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা। সেটা যে সফল হয়েছে আমি তাতেই খুশি।

এদিকে আটার সঞ্চয় শেষ। যব ভাঙ্গাতে হবে। পরদিন বসলাম এক ঝুঁড়ি যব নিয়ে। কেমন করে পেষাই করতে হয় দেখিয়ে দিলাম। বুদ্ধি তো তুখোড়। শিখে নিয়েছে প্রায়

সঙ্গে সঙ্গে। আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই ভাঙতে বসল যব। তখন ঝটি বানালাম আটা দিয়ে। দেখল অবাক চোখে খানিকক্ষণ। তারপর আমাকে সরিয়ে নিজেই বানাতে বসল ঝটি।

অস্তুত নৈপুণ্য ওর প্রতিটি কাজে। আর ভীষণ বুদ্ধি। সব শিখে নিল অল্প কিছুদিনের মধ্যে। আমাকে আর কাজ নিয়ে ভাবতে হয় না। প্রয়োজন মতো নিজেই আটা ভাঙে, ঝটি গড়ে, মাংস রাঁধে, খাবার টেবিলে এগিয়ে দেয় পরিপাটি করে। আমার আর চিন্তা কীসের!

তবে নেই একদম এটা বললেও ভুল হবে। ঘর সংসারের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তাই নিয়ে যে হাজারো রকমের দুশ্চিন্তা। এখন তো আর একলা আমি নই, দুজন এখন। দুজনের খোরাক যোগাড়ের চিন্তাটা কি কম। এতদিন যা চাষবাস করতাম সব তো কেবল নিজের কথা ভেবে। কিন্তু এখন যে সে অভ্যেস বদলাবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ আরো জমি তৈরি করতে হবে চাষের জন্যে। আরো শস্য ফলানো দরকার। সেটা অবিশ্য ঘাকঘারি কিছু নয়। ফ্রাইডেকে নিয়ে কাজে লেগে পড়লাম। অস্তুত ক্ষমতা ওর! খাটতে পারে প্রচণ্ড। আমাকে বলল, মালিক, আপনাকে এতো খাটতে হবে না। আমি তো আছি। বলে দিন আমাকে কী কী করতে হবে। সব আমি করব। আপনি শুধু বসে বসে দেখুন।

আমার যেন হাতে স্বর্গ পাওয়ার অবস্থা। এর চেয়ে সুখ আর কী থাকতে পারে জীবনে। ছিলাম পঁচিশটা বছর একাকী, সঙ্গী পেলাম তার পরে। মনের মতো সঙ্গী। এতদিন জানত না নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করতে। অর্থাৎ আমাকে বোঝাতে পারত না। ইদানীং তা-ও পারে। শিখে নিয়েছে অনেক নতুন নতুন কথা। সেটা আমার কাছে বিরাট একটা ব্যাপার। আমিও জবাবে কিছু বলতে পারি। এতদিনকার বোবা জিভে আবার ভাষা ফুটতে শুরু করেছে। ভাবি ত্প্রি পাই ওর সাথে কথা বলে। এত সরল এত অকপট ওর মন। আর ভীষণ শুন্দা করে আমাকে। প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। জানি না এর আগে এত গভীর ভাবে আর কাউকে ও ভালবাসতে পেরেছে কিনা।

তবু ঐ যে বলে সন্দেহ। চট করে কাউকে বিশ্বাস করতে মন বিদ্রোহ করে। সন্দেহের বশেই ভাবলাম একদিন—আজ্ঞা, নিজের দেশের ব্যাপারে ওর মনের ভাবটা বর্তমানে কী, সেটা একটু পরখ করে দেখা যাক। সুযোগ পেলেই কি আমাকে ফেলে পালাবে নিজের দেশে? তখন বললাম, আজ্ঞা ফ্রাইডে, তোর দেশে আগে কখনো লড়াই হয়েছে? বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, অনেকবার। আমরা খুব ভালো লড়াই। অর্থাৎ ভালো লড়াই করতে পারে। বললাম, তবে কী করে ওরা তোকে বন্দী করল?

বলল, খুব মার দিয়েছি আমরা। অসম্ভব। অর্থাৎ দু দলে ভীষণ লড়াই হয়েছে।

বললাম, তোর মুঞ্চ। তোরা মার খেয়েছিস। তাই তো তোদের এই দশা।

বলল, কী করব? ওরা অনেক। মারল। মরল। এক দুই তিন আর আমি। বন্দী। নিয়ে এল এখানে। দু হাজার লোক আমরা। কী করবে তারা?

—তোদের চারজনকে তো বাঁচাতে পারত? শক্র হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত।

—অসম্ভব। হঠাৎ যে আমাদের চারজনকে পান্সিতে তুলে পালাল। আমরা কি জানতাম?

—আর ওদের যারা ধরা পড়ল তোদের দেশে? তাদের কী হাল? তোদের দেশের লোকও কি তাদের কেটে খাবে? সেটাই কি নিয়ম?

—হ্যাঁ। নিয়ম। আমরা মানুষ খাই। খুব।

—কোথায় নিয়ে খাবি তাদের!

— যেখানে খুশি। কত দ্বীপ। কত। দেশে খাব না।

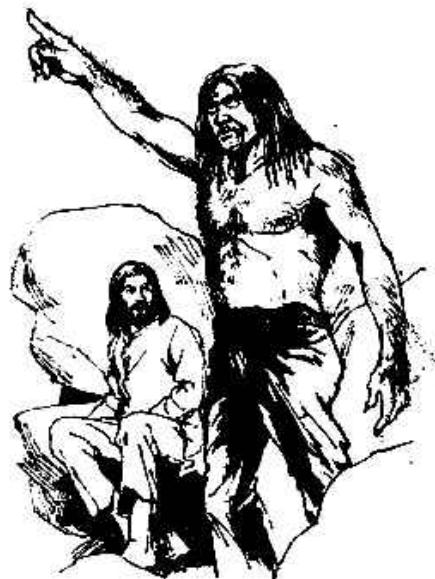
— এখানেও আসে কি তোদের দেশের মানুষ?

— আসে।

— তুই আগে কখনো এসেছিলি এখানে? অন্য কারো সাথে?

— হ্যাঁ। একবার। বলে উত্তর পশ্চিম অংশ আঙ্গুল দিয়ে দেখাল। অর্থাৎ সেই পায়ের ছাপ। আমার প্রথম দেখা সেই ভয়াবহ দৃশ্য। নিজের অজ্ঞানতেই একবার শিউরে উঠলাম।

একেই বলে হয়ত পরিহাস। যে মানুষ আগে এসেছে এখানে নরমাংস খাবার লোভে, তাকেই কিনা পরে আসতে হল বন্দী হয়ে, তার মাংস খাবে অন্য সবাই। আরো কিছুদিন পর তাকে নিয়ে গেলাম একদিন সেইখানে। দেখে চিনতে পারল। আমাকে বলল সব। পুরো বিবরণ দিল তোজের। সেবার নাকি মহা ভোজ। বন্দী ছিল সঙ্গে মোট তেইশ জন। তার মধ্যে কুড়িটি পুরুষ, দুটি নারী আর একটি শিশু। তা কুড়ি তো তখনো বলতে শেখে নি। আমাকে পাথরের নুড়ি জড় করে বুঝিয়ে দিল সংখ্যাটা। তখন নতুন করে আরো একবার শিউরে উঠলাম।



সে থাকে এই হেথায়

বললাম, হ্যাঁবে, তোদের দেশ এখান থেকে কতদূর? পান্সিতে যে আসিস, ভয় করে না? সমুদ্রে ডুবে যায় না কখনো?

বলল, ডোবে না। বেশি দূর নয় দেশ। ভোর থাকতে রওনা দেয়। তখন সমুদ্রে স্নোত কম, হাওয়াও কম। আবার ফিরে যায় সঙ্গে নাগাদ। তখনো আবহাওয়া অনুকূল।

অর্থাৎ সমুদ্রের গতিপ্রকৃতি ওরা বোবে। এই যে স্নোত বা বাতাস এর মূলে রয়েছে সূর্যের তাপ। রোদ যত প্রথর হয়, বাতাস তত বাড়ে। তদুপরি জোয়ার ভাঁটার ব্যাপারটাও কম নয়। ভাঁটার সময় ওরুনুকো নদীর জল গলগলিয়ে এসে পড়ে সমুদ্রে, তাতে স্নোত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়। এটা অবিশ্যি পরে আমি চিন্তা ভাবনা করে বের করেছি। যতদূর অনুমান, এই যে দ্বীপে আছি আমি—এটা ত্রিনিদাদ দ্বীপপুঁজের অংশ বিশেষ। নদীর উত্তর

মুখে এর অবস্থান। সেটা আকারে ইঙ্গিতে ফ্রাইডেও আমাকে বোঝাল। কত যে পশ্চি করলাম এই দেশ নিয়ে! কেমন তারা মানুষ। কত তাদের সংখ্যা, কী তাদের অভ্যাস, কটি গোষ্ঠী এখানে আছে। তা সব প্রশ্নের পারে না জবাব দিতে। শুধু বলে ক্যারিবি, অর্থাৎ এরা ক্যারিবীয় সম্পদায় ভূক্ত। ম্যাপ খুলে দেখলাম, আমেরিকা ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গেলে ওরফনুকো নদী। সেখানেই এই অঞ্চল। ফ্রাইডে বলল, নাকি সাদা চামড়ার একদল মানুষও থাকে কাছাকাছি কোন অঞ্চলে। ঠিক কোথায় সে বলতে পারে না, তবে শুনেছে বড়দের মুখে। তারা নাকি ভীষণ নিষ্ঠুর। মাঝে মাঝে সংবর্ষ লাগে তাদের সঙ্গে। তখন নাকি নির্দয় ভাবে হত্যা লীলা চালায়। অর্থাৎ স্পেনীয়। সারা দুনিয়ায় স্পেনীয়দের নিষ্ঠুরতার কথা কে না জানে।

বললাম, আচ্ছা বল্ত দেখি, আমি যদি ওদের সঙ্গে দেখা করতে চাই তাহলে কেমন করে যাব?

বলল, দুটো নৌকা লাগবে।

তার মানে? তবে ভেবে কিছুতে আর মানে পাই না। শেষে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করতে আকারে ইঙ্গিতে গা বোঝাল তার অর্থ এই, পানসিতে হবে না। লাগবে দু দুটো নৌকা জড় করলে যত বড় হয় ততখানি বড় একটা জাহাজ। তবেই তাদের দেশে যাওয়া সম্ভব হবে।

হোক জাহাজ, তাতে আমার কোনো আপন্তি বা অসুবিধে নেই। মোটমাট এখান থেকে বেরবার তো একটা রাস্তা জানা গেল। আজ না হোক কাল ফ্রাইডে যদি সঙ্গে থাকে, তবে বেরিয়ে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব। যদি সফল হই তবে ভালো, বিফল হলে ডুবে মরব। তা-ও তো বন্দীদশা থেকে মুক্তি।

এই যে এতদিন ফ্রাইডে আছে আমার সঙ্গে—ছায়ার মতো পাশে পাশে ঘোরে, খায় একসাথে বসে, শুমোয়—একবারও কিন্তু ওর মনে ধৰ্মীয় চিন্তা জাগিয়ে তোলার এতটুকু চেষ্টা আমি করি নি। একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কে তার সুষ্ঠা। কথাটার মানে সে একদম বুঝতে পারে নি, হা করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তখন বললাম, আচ্ছা বলত দেখি, এই সাগর কার হাতে তৈরি, কিংবা এই পায়ের নিচের মাটি বা মাথার ওপরের আকাশ? বলল, কে আমার —বেনামুকি। সে থাকে ওই হোস্থায়? বলে দূরে আকাশটা দেখিয়ে দিল। বললাম, সে অবার কে? বলল, জানো না তুমি? সে মন্ত বড় মানুষ। তার অচেল ক্ষমতা। আর অনেক বয়েস। এই সাগর মাটি পাহাড় টাদ সুর্বের চেয়েও বয়েসে অনেক বড়ো। বুড়ো খুখুড়ে। বললাম, বেশ তো, নয় মানলাম তোর কথা, ধরে নিলাম তোর বেনামুকি। সৃষ্টি করেছে সব। তবে সকলে বেনামুকিকে পুজো করে না কেন? কী গভীর তখন ফ্রাইডের মুখ! যেন বিরাট এক কূট তর্কের সুচিস্তিত মতামত দিতে চলেছে, সেই রকমই ভাব। বলল, করে তো। সবাই পুজো করে। পুজো করে বলেই তো আকাশ গোল, সাগর গোল, মাটি গোল, পাথর গোল—সব গোল। পুজো মানেই গোল। বললাম, আর যারা মারা যায় তারা? কোথা যায় মৃত্যুর পর? বলল, বেনামুকির কাছে।—কী করে তখন বেনামুকি? সবাইকে পটাপট গিলে থায়? বলল, হ্যা, খুব ক্ষিধে তার। তাই খায়।

তারপর থেকেই তার মনে ঈশ্বর সম্পর্কে প্রকৃত বোধ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু করি। বললাম, সত্ত্বিকারের ঈশ্বর কোথায় থাকেন জানিসু, এই আকাশে। ওর ওধারে স্বর্গ। তাঁরই কর্তৃত্বে চলে এই গ্রহ নক্ষত্র তারা। চলে এই পৃথিবী। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থাৎ একাই অসীম শক্তির অধিকারী। কারূর সাহায্য তার দরকার লাগে না। আমাদের সব

যমন তিনি দুহাত ভরে ঢেলে দেন, আবার ইচ্ছে হলে সব কিছু কেড়েও নেন তিনিই।

দেখি শুনছে খুব মন দিয়ে। সারা চোখে মুখে অঙ্গুত আগ্রহের দৃতি।

তখন যীশু খ্রিস্টের গল্প বললাম। তাঁর সৃষ্টি প্রার্থনার কথা বললাম। ঈশ্বর স্বয়ং পাঠিয়েছেন তাঁকে এই পৃথিবীতে তাই তো আশৰ্য শক্তি নিয়ে রচনা করতে পেরেছেন অনবদ্য সব প্রার্থনা গীতি। সে প্রার্থনা ঈশ্বর স্বর্গ থেকেও শুনতে পান।

ফ্রাইডে বলল, তবে তো বেনামুকির চেয়ে তিনি অনেক অ-নে-ক বড়। সে তো থাকে ঐ পাহাড়ের মাথায়। তবু কই সব কথা যে শুনতে পায় না।

বললাম, তুই বুঝি পাহাড়ের মাথায় বেনামুকির সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলি?

বলল, না না, আমরা যাই নি। আমাদের যাবার নিয়ম নেই। কম বয়েস যে আমাদের। যায় বুড়োর দল। তারা উকাকী। তারা বেনামুকির সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে।

উকাকী অর্থাৎ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন। এটা আমি প্রশ্ন করে জেনে নিলাম।

বললাম, তারপর?

—তারপর আর কী? সব জেনে ফিরে আসে তারা। বেনামুকী কি বলল আমাদের এসে বলে। আমরা সেই ভাবেই কাজ করি।

অর্থাৎ ধর্মের নামে বুজবুকি। সভ্য জগতের সঙ্গে নেই কিছুমাত্র সংযোগ বা সংস্পর্শ, ধর্মের নামে এখনেও চলে নানান কলা কৌশল। পৃথিবীর সব দেশেই হয়ত এটাই চিরাচরিত প্রথা।

তবে ভুল ভাঙানোটা দরকার। দরকার মন থেকে এই অঙ্গ বিশ্বাস দূর করা। বললাম, দেখুন, এই যে বুড়ো মানুষদের পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বেনামুকির সাথে কথা বলে সব জেনে ফিরে আসা গোটা ব্যাপারটাই মিথ্যে, ভুয়ো। এর মধ্যে সত্যের নাম গুরু নেই। তোদের এইভাবে ওরা দিনের পর দিন ঠেকায়। যদি সত্যি সত্যি সেই নির্জনে কারুর সঙ্গে তারা কথা বলে। তবে সে ঈশ্বর নয়, পিশাচ। পিশাচই বাস করে একমাত্র ঐ নির্জন বন্দুর পরিবেশে।

বলে পিশাচ কী, কেমন ভাবে তার জন্ম হয়। বাইবেলে এ সম্বর্কে কী লেখা আছে—সব বললাম। শুনল মন দিয়ে। তবু ঐ-চট করে কি আর বিশ্বাস যায়! মনে যে এতদিনের ক্লেদ গ্লানি আর কুসংস্কারের বীজ। তখন শুরু করলাম একদম গোড়া থেকে। এই বিশ্ব, তার জন্ম, তার সৃষ্টিতে ঈশ্বরের অবদান, আমাদের জন্ম, আমাদের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ, আমাদের পৃণ্য, আমাদের পাপ—সব একটু একটু করে ব্যাখ্যা করে, উদাহরণ দিয়ে বোঝালাম। দেখি শুনছে ভারি ভূম্য হয়ে। আর চোখে বিশ্বাসের ঝিলিক। পিচাশের কথাও বললাম। তার সৃষ্টি, তার ক্রিয়াকাণ্ড। কেমন করে প্রভুর সৃষ্টি দুনিয়াকে ধৰ্ম করার জন্যে সে সর্বদা ফন্দি ফিকির থাঁজে। কিন্তু পারে না যেহেতু সে-ও প্রভুরই সৃষ্টি। প্রভুর ক্ষমতা তার তুলনায় অনেক বেশি। বুঝতে পারল ফ্রাইডে। বলল, তাই যদি হয়, তবে ঈশ্বর পিশাচকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন? মেরে ফেললেই তো পারে।

আমি আবাক। হতভম্ব যাকে বলে। কী দেব এর উত্তর? প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি এই মাঝি, কিন্তু আমি কি ধর্মপ্রচারক যে প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দেবার ক্ষমতা রাখি। তাই চেটা করলাম প্রথমে প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে। শুনেও না শোনার ভাব করলাম। ফের বলতে বললাম। হুবহু একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। তখন বললাম। শেষ করার সময় এখনো আসে নি। শাস্তি পেতে আরো অনেক দেরি আছে। কবে পূর্ণ হবে তা একমাত্র

ঈশ্বরই জানেন। তিনি সময় মতো সঠিক ব্যবস্থা নেবেন। এটা ঠিক মনঃপূর্ণ হল না তার। বলল, কিন্তু কবে হবে সেই সময়? কতদিন পরে? এখন মারলে অসুবিধে কী? বললাম, অসুবিধে আছে। পাপীকে অনুত্তপ করার সুযোগ করতে দেয়। অনুত্তপই তার শাস্তি। অনুত্তপের বোকা পূর্ণ হলে তবেই আসে বিনাশ। অর্থাৎ শেষ। তারপর তার মৃক্ষি।

এ জবাবে দেখি বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে। ভাবল চৃপচাপ বসে খানিকক্ষণ। আমারও ঘাম দিয়ে যেন ঝুর ছাড়ল। কী কুক্ষণে যে শুরু করেছিলাম ওকে ইই সব বোঝাতে! কিন্তু আর নয়। এরপর নতুন কোনো প্রশ্ন করলে জানি না মুশকিলে পড়ব কিনা। তাই চটপট ব্যঙ্গসমষ্টি ভাবে উঠে দাঢ়ালাম। যেন হঠাতেই মনে পড়ে গেছে কোনো কাজের কথা। ওকেও একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম দূরে কোথাও। গেল চলে! আমারও স্বাস্তি!

স্বাস্তি ছাড়া একে বলবই বা কী। আমার কি বাপু অত জ্ঞান গাম্ভীর্য আছে! তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠা যে অন্য কারো চেয়ে কম নেই এটা আমি নিজেও বুঝতে পারি। নিষ্ঠা দিয়েই তো চিনেছি ঈশ্বরকে। আমার দাতা, আমার ত্রাতা, আমার রক্ষককে। কিন্তু অতশত প্রশ্নের উত্তর যে জানি না। ফ্রাইডের চোখে আমি এক মহান ব্যক্তিত্ব কিন্তু যদি প্রশ্নের গুঁতোয় সেই ধারণা ওর মন থেকে মুছে যায়! সে ভয়টাও কিছু কম নয়। মেটমাট এড়িয়ে যাওয়াই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের কাজ। যতটুকু জানি তার বেশি এগোনো কোনোভাবেই উচিত নয়। কী বলতে কী বলে ফেলব, তার তো কোনো ঠিক নেই। ঈশ্বর আমার কাছে কিছু অভিজ্ঞতার সমষ্টি। অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনেছি তাকে এই নির্জন পরিবেশে। প্রশ্ন করলে এবার থেকে সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলব। এর বাইরে একচুল কোথাও নড়ব না।

এবং সেইভাবেই কথা হয় এরপর থেকে। প্রশ্ন করে ফ্রাইডে একের পর এক। আমি একের পর এক আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি।—কেমন করে এলাম এখানে, কেমন করে বাসা বাধলাম, কী কী ধারণা জন্মাল, কেমন করে ঈশ্বরের আশীর্বাদে ঝান্দাশস্য চাষ করতে শিখলাম। কীভাবে সংগ্রহ করতাম অপরাপর খাদ্য। লোডের বশবর্তী হয়ে ডোঁওয়া চড়ে দ্বীপ জয় করতে গিয়ে একবার কী বিপন্নি হয়েছিল—সব একটার পর একটা বলি। অবাক তন্ময় হয়ে শোনে ফ্রাইডে। আর এক একটা ঘটনাকে নিজের ইচ্ছামতো ভগবৎ চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে নেয়। সেটাও আবার বলে আমাকে। আমার মতামত জানতে চায়। আমি সায় দিই। দিনের পর দিন চলে এই অস্তুত খেলা।

তবে আমার দৈনন্দিন বাইবেল পাঠে কিন্তু ভাঁটা পড়ে নি। রোজ বসি নিয়ম মতো। পড়ি একমনে, ফ্রাইডে বসে শোনে তন্ময় হয়ে! এটা ওটা প্রশ্ন করে। সাধ্যমতো জবাব দিই। স্পষ্ট বুঝাতে পারি। একটু একটু করে খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি ওর আসক্তি জন্মাতে শুরু করেছে। সেটা মঙ্গল। হয়ত একদিন খ্রিস্টধর্মে দীক্ষাও গ্রহণ করবে। করুক। আমি মনে প্রাপ্তে তাই চাই। তার পূর্ণ কৃতিত্ব হবে আমার। সেটাই সবচেয়ে বড় গৌরব।

এবং এইভাবে দুটি ভিন্ন ধরনের মানুষ আমরা পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছি। যাকে বলে আত্মার আত্মীয়। অনেক অন্তরঙ্গ এখন আমরা। মোটামুটি ফ্রাইডে সম্পর্কে নির্ভুল একটা ধারণা আমার মনে জন্মেছে। একটু একটু করে সব ওকে শেখাতে শুরু করেছি। সুরে বেড়াই সঙ্গে নিয়ে দ্বীপের এ মাথা থেকে ওমাথা অব্দি। বন্দুক চালানো শিখিয়েছি। তবে দিই নি ব্যবহারের জন্যে এখনো বন্দুক। পরিবর্তে দিয়েছি একটা ছুরি আর ছেটো একখালি হাত কুড়ুল। আমারই মতো একটা বেল্ট করে দিয়েছি কোমরে বাঁধার। তাতে ঝুলিয়ে রাখে কুড়ুল। ছুরিটা প্রায় সময় হাতেই রাখে; কোনোদিন তো পায় নি এমন ছুরি তাতে, এত যে ধার হতে পারে এটা ওর কল্পনার বাইরে। প্রায় সময়ই দেখি ছুরি দিয়ে

একটা না একটা কিছু কাটছে।

ইউরোপ দেশটি কেমন, তারও একটা মোটামুটি বর্ণনা দিয়েছি। বিশেষ করে ইংল্যান্ডের। কেমন ভাবে থাকতাম সেখানে, কী কী আমাদের রীতিনীতি, কী অভ্যাস, দীর্ঘবয়কে সেখানে আমরা কী চোখে দেখি, জাহাজে কী কী সওদা নিয়ে ভেসে পড়ি সমুদ্রে—সব ওর কাছে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমার সমুদ্র যাত্রার বিবরণ দিতেও বাকি রাখি নি। তিনি বাবের কথাই বলেছি। এমনকি নৌকাডুবির পর সেই যেখানে এসে পড়েছিলাম বালির উপর, সেটাও একদিন ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এসেছি।

সেই নৌকোটাও দেখালাম। বালির মধ্যে গেঁথে থাকা সেই নৌকা। আমি পারি নি একচুল নড়াতে। ঘুরে ঘুরে ফ্রাইডে সবদিক থেকে জরিপ করল। আমি বললাম, কী ব্যাপার, এত যে দেবলি চারপাশ থেকে? কারণ কী? বলে, দেখেছি এরকম নৌকো আগেও। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে আসে।

অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। সেটা একটু পরে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম। সমুদ্রে ঝড় উঠলে যখন টালমাটাল হাল, তখন নৌকোয় করে আত্মবন্ধন জন্যে ভেসে পড়ে নাবিক। বাতাস ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে ভেড়ায় তাদের দীপে। নাবিকদের কী পরিণতি হয় সেটা সহজেই অনুমেয়। নৌকাটা ওরা নষ্ট করে না, অক্ষত ভাবে রেখে দেয়।

এটা যদি সত্যি হয় তবে ওদের দেশে এরকম নৌকো বিস্তর আছে। সেক্ষেত্রে একটা অন্তত পেলে সমুদ্রে ভেসে পড়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে আরেকটুকু বিশদ করে জেনে নেওয়া দরকার।

বললাম, কেমন সে নৌকো, আমাকে বল।

বলল, ভাল। তাতে বোঝাই সাদা চামড়ার মানুষ।

—কজন?

দুহাতের আঙ্গুল দুবার তুলে দেখাল,—সতের জন।

—কী করেছিস তাদের? কেটেকুটে খেয়ে নিয়েছিস নির্ধাঃ?

—না। সাদা চামড়ার মানুষ আমরা খাই না। তারা আমাদের ওখানে থাকে। এখনো আছে।

অর্থাৎ সেই জাহাজের নাবিক এরা—সেই যে বন্দুক ছুড়ে বিপদের কথা জানান দিয়েছিল। আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি এটা ওটা নানান জিনিস।

সে প্রায় চার বছর আগের কথা। তবু ভালো, নরখাদকের দল তাদের হত্যা করে নি।—তা তোদের সঙ্গে বগড়াঝাঁটি হয় না?

বলল, না, ওরা বক্স। বক্স ভেবেই ওদের থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ওদের কোনোদিন কোনো বিপদ হবে না।

—যদি অন্যায় করে, — খাবি না কেটেকুটে মাংস?

বলল, না, মাংস আমরা সব সময় খাই না। মানুষের মাংস। যখন যুদ্ধ হয়, হেরে যায় কেউ—তখনি খাই। বন্দীদের মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনো অপরাধ নেই।

এর বেশ কিছুদিন পরের কথা।

দারুণ ঝকঝকে রোদ। আর মাথার ওপরে সুনীল আকাশ। কুয়াশার লেশ মাত্র নেই। আমি আর ফ্রাইডে পুবের দিকের পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে। যতদূর চোখ চলে শুধু জল আর জল। বহুদূরে রেখার মতো একসারি গাছপালা। ওটা আমেরিকা। আমি অনুমান করতে পারছি। পিছনে ফিরলাম। দেখি একটা কাছেই দীপ। কাছে বলতে একেবারে

হাতের গোড়ায় নয়, টানা পথে অন্তত ক্রোশ তিনেকের মতো দূর। ফ্রাইডেরও নজর দেছে সেদিকে। আর কী উল্লাস। লাফাতে শুরু করেছে দেখি শিশুর মতো। বলল, ঐ দেবুন, ঐ আমার দেশ, আমার ঘাটি। ঐ যে !

সে যে কী সরল কী আনন্দের মুখচূবি ! আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। বিষ্ণু বিষ্ণু আমার অবস্থা। আর মনে একটু একটু করে রাগ জন্ম নিছে। আর বিদ্বেষ। তার ঘানে তোমার মনের আসল কথা এই। আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভালো লাগে না ! দেশে ফিরে যেতে চাও তুমি ! সেটাই তোমার একান্ত বাসনা !

বলব কী, মুহূর্তে যেন ভারি নীচ ভারি নিষ্ঠুর মনে হল ফ্রাইডেকে। আর হিংসে।—আমি ধাকব বন্দী অবস্থায় এখানে, আর তুমি দেশে ফিরে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাবে ! তারই জন্যে এত উল্লাস। তাহলে এই যে ওর জীবন রক্ষা করলাম, এই যে এত কিছু শেখালাম ওকে—ধর্মের এই এত সব কথা,—সব মিথ্যে ? কোনো কিছুরই দাম নেই।

সে এমনই অবস্থা, ভালোভাবে ওর দিক আর তাকাতে পাছি না। কথা বলতে পারি না মন খুলে। কী যেন একটা বাধা সদা সর্বদা আমাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ওকে আমি এখন রীতিমতো হিংসে করতে শুরু করেছি। হায়, হায়, তখন কি জানি সে আমার কত বড় ভুল ! আমি আমার সভ্য দুনিয়ার নিয়মের ছকে ফেলে ওকে বিচার করতে চেয়েছিলাম। সে বিচার একান্তভাবে আমারই করা বিচার। সত্যের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। অসভ্য দুনিয়ার মানুষ অন্য ধাতুতে তৈরি। তারা ভালবাসতে জানে প্রাণ দিয়ে। জীবনের সৃষ্টিতিসৃষ্টি মূল্যবোধ দিয়ে বারে বারে লাধি মারে আমাদের সভ্য দুনিয়ার মুখে।

ঘটনাটা খোলসা করে বলি।

হিংসেয় তো সর্বদা আমি জলে পুড়ে মরছি। সেই চোখ দিয়েই বিচার করি ওর প্রতিটি কার্যকলাপ। ওর কিন্তু কোনো কাজেই কোনো ভুল নেই। সেই সরলতা সেই আন্তরিকতা নিয়ে করে প্রতিটি কাজ। সারাদিন ছায়ার মতো থাকে আমার সাথে। আমাকে সন্তুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এমন কি, আমার মনে যে এই এত জলুনি—এটাও ওর সহজ সরল চোখে ধরা পড়ে না।

একদিন সেই পাহাড়ের মাথায় উঠেছে গিয়ে ফের। পাশাপাশি দুজন দাঙিরে। সেদিন আবহাওয়া তেমন পরিষ্কার নয়। ধোঁয়ার মতো কুয়াশার একটা প্রলেপ। তির্যক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, কীরে, যাবি না তোর দেশে ? বলল, যাব। দেশ আমার খুব ভালো। খুব ভালো লাগবে যেতে পারলৈ। বললাম, গিয়ে তো ফের মানুষের মাংস খাবি। ভুলে যাবি সব কিছু তাই না ? বলল, মোটেই না। আমি আর খাব না। সবাইকে বলব মাংস খাওয়া ছেড়ে দিতে। স্বিন্দরের কথা বলব। চাষ করব। ছাগলের দুধ খেতে বলব।—তবে আর কি, আমি বললাম, তোর তো কপালে অনিবার্য মৃত্যু। ওরা সব শুনে তোকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলবে। বলল, না না, খাবে না। শুনে আমাকে ভালবাসবে। আমি যা বলব তাই করবে। নাকি সাদা চামড়ার সেই সতেরজনের কাছ থেকে তাঁরা অনেক ভালো ভালো জিনিস শিখেছে। কই, তাদের তো মারে নি বা কেটে কুটে খেয়ে নেয় নি ! বললাম, বেশ তো, যা চলে। তোর যদি ইচ্ছে হয়, এক্ষুনি যা। বলল, কেমন করে যাব ? অতখানি কি সাঁতার কেটে যাওয়া সম্ভব ? বললাম, ঠিক আছে, আমি নয় তোকে একটা পানসি বানিয়ে দেব। বলল, আর আপনি ? বললাম, আমার আর কি, এখানে

থাকব। বলল, আপনি না গেলে আমি যাব না। তখন হাসলাম, বললাম, আমি গেলে আমাকে তো তোরা কেটেকুঠে খেয়ে ফেলবি। বলল, না না, ছঃ, আপনাকে সকলে খুব ভালবাসবে। আমি বলব সবাইকে আপনায় কথা। ভালবাসতে বলব।

সেই দুরাশাটা ঘনের মধ্যে ফের পাক খেতে শুরু করেছে। বন্দী দশা থেকে মুক্তির সেই আদিম ইচ্ছা। যাব নাকি ওর সাথে ওর দেশে! সেই সতের জনের সাথে দেখা হবে। হোক না স্পেনীয় কি পুতুগিজ—কী আসে যায়! তারাও তো কলী। দেশে ফেরার আকুলতা কি তাদের মধ্যেও কিছু কম? সবাই মিলে যুক্তি করে একটা রাস্তা বের করব। খেটে খুঁটে নয় তৈরি করব মন্ত একটা নৌকো। আমার ডোঙাটাও নিয়ে যাব সাথে করে। নয় আর কিছু না হোক, সেটাতে চেপেই ভেসে পড়ব।

নিয়ে গেলাম তখন তাকে আমার সেই ডোঁজার কাছে। বললাম, কীরে, এতে চেপে দুঃজনে আমরা যেতে পারব তোর দেশে? বলল, না, এটা বড় ছাটো। দুঃজন যাওয়া যাবে না। একজন হলে হয়। বললাম, বেশ তো, আয় তবে দুঃজনে মিলে একটা বড় নৌকো বানাই। গাছ কেটে। তাতে খাবার দাবার সব দিয়ে দেব! আমি নয় এখানেই থাকব। আগে তুই তাতে চেপে তোর দেশ থেকে ঘূরে আয়।



রাগ না? আমি কি রাগ চিনি না

শনে অন্ধি সে যে কী থমথমে মুখের ভাব, সে আমি বলে বোঝাতে পারব না। হাসি খুশি মানুষ হঠাত থম মেরে গেলে যে রকম হয়। দেখি চোখ তুলে তাকায় না আর আমার মুখের দিকে। বললাম, কী হল, চুপ করে গেলি কেন? কী হয়েছে?

বলল, আমি জানি না। আমি কী করেছি আপনার যে আপনি ঐসব বলছেন?

বললাম, কী আবার বললাম তোকে?

বলল, এতো, এ রাগ। আমি সব বুঝতে পারছি। আপনি আমাকে মোটে ভালবাসেন না।

আমি অবাক। বললাম, কোথায় রাগ করলাম আমি?

—রাগ না? রাগ কি আমি চিনি না? এ যে বললেন, তুই একলা গিয়ে ঘূরে আয়।

আমি এখানে থাকব।

—তা এর মধ্যে রাগ কোথায়?

—রাগই তো। আমাকে একলা পাঠাবেন। কেন, আমি তো আপনাকে ছাড়া যাব না বলে দিয়েছি।

—কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

—আপনি শেখাবেন সব। ভালো ভালো জিনিস। ইশ্বর! মাংস না খাওয়া। আমাকে যে সব শিখিয়েছেন।

—কিন্তু আমি যে শেখাব, আমি নিজেও কি ছাই সব কিছু জানি, বুঝি?

—জানেন। সব আপনি জানেন। আপনাকে যেতেই হবে।

—কিন্তু যদি তোর দেশের অন্য কারো আমাকে ভালো না লাগে? যদি বন্দী করে আমাকে? মেরে ফেলে?

—কেন মারবে? কেন করবে বন্দী? আপনার সাথে কি যুদ্ধ হয়েছে যে আপনাকে বন্দী করতে হবে?

—তবু থাক। ফ্রাইডে, তুই-ই বরং গিয়ে ঘুরে আয়।

—না, যাব না আমি। কিছুতে যাব না। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চান। আমাকে ভালবাসেন না। আমি যাব না। কক্খনো না।

বলে কাঁদতে লাগল বারবর করে। সে একেবারে শিশুর মতো কান্না। আমি হতবিশ্বল। কী করব বুঝতে পারছি না। আর ঘেন্না হচ্ছে নিজের উপর। এই মানুষকে কিনা আমি ভুল বুঝেছিলাম। মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম। হিংসে করেছিলাম অবুঝের মতো। আমার মতো পাপী অবিবেচক হয়ত আর সারা দুনিয়ায় নেই।

আসলে আমাকে ভালবাসে ভীষণ। বুকের মধ্যে আমার জন্যে জমা আছে একরাশ দরদ। আমাকে ছেড়ে ও যে আর কোথাও যাবে না এ ব্যাপারে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। দেশে যে যেতে চায় সেটাও আমার মহিমা জনসমক্ষে জাহির করার জন্যে। আমাকে ও দেশের মানুষের কাছে ইশ্বরের প্রেরিত দৃত বলে সাব্যস্ত করতে চায়। ওর ঐকাণ্ডিক অভিলাষ, আমি হয়ত ওর দেশের মানুষের প্রভূত উন্নতি করতে পারব, তাদের অনেক ভালো জিনিস শেখাতে পারব, তাদের মঙ্গল করতে পারব। তাই আমাকে নিয়ে যেতে চায় দেশে। তাই বারবার বলে, ওরা আপনার কিছুটি করবে না। আপনাকে ভালবাসবে। এটা ওর দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আমি তো আর বাস্তবিক সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যেতে চাই না। আমার ইচ্ছে সেই সতের জনের সঙ্গে দেখা করার। তাদের সাথে যুক্তি পরামর্শ করার। কেমন করে পালাতে পারা যায় তার ফল্দী আঁটব। তবে আর দেরি কেন। ফ্রাইডে আর আমি দুজনেরই যখন ইচ্ছের অন্তত খাকিটা মিল—তাহলে নৌকো বানাবার তোড়জোড় করি। পাকাপোক্ত নৌকো। তাতে করে দুজন জমাব পাড়ি।

তখন শুরু হল বৃক্ষানুসন্ধান। এবার আর আগের বাবের মতো ভুলের খঘরে পা বাড়াচ্ছি না। জলের ধারে ধারে বিস্তর গাছ। একেবারে বলতে গেলে কিনার ঘেঁষে। কাটিব সেরকমই একটা। সেখানে বসেই প্রস্তুতির কাজ সারব। তবে আর নৌকো জলে ভাসানো নিয়ে আগের বাবের মতো অত বকমারি হবে না।

ফ্রাইডেই খুঁজে বের করল গাছ। আমার চেয়ে এ ব্যাপারে অনেক পাকা। বেশ পুরুষ আকার। তবে নাম জানি না গাছের। ফেলল কেটে মাটিতে। ডাল পালা ছাঁটিল। বলে পোড়াব এবার। পুড়িয়ে বানাব পান্সি। আমি নিরস্ত করলাম। হাতুড়ি বাটালি কুড়ুল

দিলাম এগিয়ে। দেখিয়ে দিলাম কেমন ভাবে কাটতে হয়। অমনি শিখে নিল চটপট। খাটল একটানা প্রায় একমাস। আমিও হাত লাগালাম। ইল ভারি চৰৎকার। তখন তাতে হাল বসিয়ে দিলাম। জানত না হালের কথা। বুঝিয়ে দিলাম কী এর কাজ। দেখে তো ভারি আহ্বাদ। মোটমাট ঘষে মেজে নিপুণ করতে, প্রয়োজনীয় সাজ সরঞ্জাম বসাতে লাগল আরো প্রায় পনের দিন। তারপর ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলাম জলে। অপূর্ব। কিন্তু এই মুহূর্তে তো আর যাচ্ছ না। তখন কাছাকাছি একটা পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখলাম।

নামালাম যখন প্রথম ঠেলতে ঠেলতে, সে কী আনন্দ ফ্রাইডের! একলাফে চড়ে বসল পানসিতে। দাঢ় বাইল, ছুটল খানিকটা হু হু বেগে—কী সাবলীল ওর দাঢ় টানবার ভঙ্গি! আর স্বচ্ছ খুব। বলল, কোনো চিন্তা নেই। কোনো বাতাস পারবে না একে ডুবিয়ে ফেলতে। আমি বলে দিচ্ছি। আপনি মিলিয়ে নেবেন। তখন পান্সি ধামিয়ে, তৈরিই ছিল সব কিছু—মাস্তুল আর পাল খাটিয়ে দিলাম। ফ্রাইডে তো অবাক। ফুরফুর করে বইছে বাতাস আর পান্সি চলেছে আপন খেয়ালে। দাঢ় বাইবার আর দরকার নেই। এরকম আবার হয় নাকি! দেখি অবাক চোখে তখনো দেখছে। তখন বুঝিয়ে দিলাম। কী আনন্দ তার!

তা বললাম যত সহজে, কাজে কিন্তু লেগেছে অনেক সময়। মাস্তুল বসানো থেকে শুরু করে পাল খাটানো, হাল জুড়ে দেওয়া, মোটমাট সব দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ যাকে বলে—সময় আমার লাগল মোট দুটি মাস। তখন সে একেবারে দেখবার মতো জিনিস। ডুববার আর ভয় নেই। বাতাস গ্রহণ করা থেকে শুরু করে হাল স্বুরিয়ে দিক বদল—কিছুতেই আর কমতি বলতে কিছু নেই।

কিন্তু বসালেই তো হয় না, এ সবের যথার্থ ব্যবহার জানা চাই। বুঝতে হবে কোন্টা দিয়ে কী কাজ হয়। সেটা একে একে ফ্রাইডেকে হাতে কলমে শিখিয়ে দিলাম। ওর তো জ্ঞান বলতে শুধু দাঢ় টেনে পানসি বাওয়া। অকূল দরিয়া কি আর ঐ জ্ঞানে চলে। অনেক কিছু লাগে যে শিখতে। অনেক ব্যাপার। তবে না পাঞ্চা দেওয়া যায় স্বোত্তের সাথে, হাওয়ার সাথে। শিখে নিল সব। একটা কম্পাসও বসিয়েছিলাম। বলতে ভুলে গেছি। শুধু সেটা নিয়েই যা গোল। কিছুতে পারি না তার কাণ্ডাকাণ্ড বোঝাতে। বুঝবার দরকারও অবিশ্য তেমন একটা নেই। কালেভদ্রে কুয়াশা জমে এ অঞ্চলে। আকাশ মোটের উপর নির্মল। দিকভ্রম হবার কোনো কারণ নেই। আর রাতে তো সারা আকাশ তারায় তারায় ঝলমল। দিনের চেয়ে দেখি এরা রাতের আকাশ চিনতেই বেশি অভ্যন্ত। তখন আমি আর কম্পাস—শিক্ষা নিয়ে জোর জবরদস্তি করলাম না।

সাতাশ বছর চলছে এটা। আমার বন্দীদশার দীর্ঘ সাতাশ বছর। কীভাবে যে কেটে যায় সময়! ফ্রাইডেকে পেয়েছি তিনবছর আগে। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেমন হু হু করে পার হয়ে গেল। মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। তবু যাহোক একে পেয়ে অব্দি আমার নিষ্ঠুরস জীবনে কিছু সাড়া পড়েছে। গল্প করার লোক পেয়েছি। নানান পরিকল্পনা করতে পারি দুজনে বসে। কাজও করি এখন চার হাতে। তাতে চটপট যে কোনো বড় বড় কাজও হয়ে যায়। তবে এতকিছুর মধ্যেও কিন্তু ভুলি নি আমার দ্বীপে আসার সেই প্রথম দিনটির কথা। এখনো ফি বছর ৩০ শে সেপ্টেম্বর এলে উপবাস করি, সারাদিন তস্য থাকি ইস্বরের আরাধনায়। এদিন আমাকে দিয়ে যে বিশেষ কোনো কাজ হবে না, এটা ফ্রাইডে আজকাল ভালোমতোই বুঝে গেছে। আমাকে সেদিন আর দাঁটায় না বেশি। কত যে ধন্যবাদ দিই ইস্বরকে সেদিন! হিসেবে মাপা যায় না। আর কেবলই মনে হয়, আমার

মুক্তির দিন বোধহয় সমাগত। আর বেশিদিন এই নির্জনে নিরালায় একটেরে হয়ে পড়ে থাকতে হবে না। একটা কিছু অস্তুত ঘটনা দ্রুত ঘটবে। আমি নিশ্চিত সে ব্যাপারে। কিন্তু কি সেই ঘটনা—বিস্তর ভেবেও তার কোনো হদিশ করতে পারি না।

দেখতে দেখতে বর্ষা। আমার পক্ষে বড় করুণ বড় দৃঢ়খ্রে সেই ঝুঁতু। মোটে সহ্য হয় না মেঘ ধোওয়া জল। বাইরে তো বেরুতে পারব না এই দুমাস। তাই আগে ভাগেই যা করার করে ফেললাম। পানসি এনে রাখলাম বাড়ির কাছের সেই নালায়। ফ্রাইডে আর আমি দুজনে মিলে ছোটো একটা খাড়ি মতো খুঁড়ে ফেললাম। যাতে জলের তোড়ে নাও না ভেসে যায়। বাঁধ মতো দিলাম এক ধারে। বাইরের জল যাতে চুকতে না পারে। অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণের সব বন্দোবস্তই পাকা। বৃষ্টির অবিশ্রান্ত জলে যাতে কাঠ না পচে যায় তার জন্যে ওপরে তুললাম ছোট্ট এক ফালি চালা। তাতে দিলাম যাবতীয় খড় আর ডালপালার ছাউনি। ব্যস্ত, আর চিন্তা কীসের! থাক এইভাবে পড়ে দুটো মাস। বর্ষা কমুক। তারপর নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে অভিযানে নামা যাবে। মোটমাট একটা না একটা কিছু এবার করবই।

দেখতে দেখতে নভেম্বর সমাগত। বৃষ্টি বাদল নেই। আবহাওয়া সর্বদাই পরিষ্কার। এবার যাত্রা হবে শুরু। ভিতরে ভিতরে তারই তোড়জোড় চলছে। দরকার যে অনেক জিনিস সঙ্গে নিয়ে যাবার। জল থেকে শুরু করে খাবার দাবার—সে অচেল আর কি। যোগাড় করছি তাই একে একে। ইচ্ছে আছে দিন পনের পুরে ভেসে পড়ব দরিয়ায়। মোটমাট যাত্রার ব্যাপার নিয়ে ভারি ব্যস্ত আমি। দৈনন্দিন আহার্য অন্বেষণে সেদিন সকালে আর বেরনো হয়ে ওঠে নি। ফ্রাইডেকে বললাম, যা তো একবার, দেখ দেবি নিদেন পক্ষে একটা কাছিম জোটাতে পারিস কিনা। হপ্তায় একদিন আমরা কাছিমের ডিম খাই। নিয়মরক্ষার খাতিরে তো বটেই, অধিকতু বেরুতে পারি নি আজ, সেই কারণে ওকে কাছিমের খোঁজ করতে বললাম। চলে গেল ফ্রাইডে। আমি গোছ গাছের কাঞ্জ করছি আপন মনে, হঠাৎ শুনি ফ্রাইডের পরিত্রাহি ডাক—মালিক, মালিক! সর্বনাশ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাইরে আসুন। হা ইংৰেজ, কী করি এখন! তখন বাইরে এলাম। বললাম কীরে, এমন হাঁক ডাক করছিস কেন? কী হয়েছে? বলল, ঐ দেখুন। আপনার দূরবীনটা চোখে লাগান। ছটা মোট নাও। এক, দুই, তিন। আরো এক দুই তিন। কূলে এসে ঠেকল সবে। আমি অমনি ছুটতে ছুটতে চলে এলাম। হায় হায়, এখন কী হবে!

সাঞ্চনা দিলাম। মনে সাহস যোগালাম। ভয় পেয়ে গেছে যে ভীষণ। নিজের জন্যে ভয়। ওর ধারণা, ওর খোজেই এসেছে ওর দেশের মানুষ। দলে ভারি হয়ে এসেছে। তাহলে আর কীভাবে বাঁচবে। এবার তো ধরার সঙ্গে সঙ্গে ব্যতম। তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে খাবে। আমিও কি রেহাই পাব? অতগুলো মানুষের বিরুদ্ধে পারব কি লড়াই করতে! আমি তো কোন্ ছাড়, স্বয়ং দেশের সেনাপতি এলেও পারবে না। তাহলে উপায়?

বললাম ধৈর্য ধরতে। চঞ্চল হলে কি আর কিছু ঠিক করে ভাবনা চিন্তা করা যায়! তবে একটা কথা, তুমি যে অবস্থাতে থাক না কেন, লড়াই তোমাকে করতে হবেই। সে পঞ্চাশ জন হোক কি দুশ। কীসের পরোয়া! মৃত্যু যখন সুনিশ্চিত তখন যে কোনো ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন দেখা দিলে নিতে হবে বৈকি। একমাত্র ইংৰেজ ছাড়া কেউ কি বলতে পারে কীরকম ভাবে কী করলে আত্মরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

বললাম, দেখ ফ্রাইডে, তোকে কিন্তু দরকার হলে গুলি চালাতে হবে। অন্তত জান না

নিতে পারিস্ব, গুলির শব্দে ভয় ধরিয়ে দিতে হবে। কী পারবি তো? বলল, আমি চালাব
গুলি! তাহলেই হয়েছে। আপনি আর লোক পেলেন না। বললাম, ওকথা আমি
একেবারে শুনতে চাই না। গুলি তোকেই চালাতে হবে, প্রয়োজনবোধে দুটো একটা
মানুষও মারতে হবে। তার আগে এখন একবোতল আরক খেয়ে নে।

আরক অর্থে দ্বিতীয় জাহাজ থেকে আনা সেই পেটি বোঝাই মদ। কয়েকটা এনে রেখে
দিয়েছি বাড়িতে। বাকি সব সেই লুকোনো গুহায় রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই দেখি বেশ
চনমনে ভাব। খুব সাহস তখন মনে। দুটো পিস্টল দিলাম তখন ওর হাতে। আর একটা
বন্দুক। আমার সঙ্গে তো যা থাকার আছেই। একটা কুড়ুলও দিলাম।

উঠলাম গিয়ে পাহাড়ের মাথায়। দূরবীনে ঢাক রাখলাম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সকলকে।
একুশ জন বর্বর। সঙ্গে তিন বন্দী। এক এক পানসিতে এক এক জন। হাত পা বাঁধা।
ফেলে রেখেছে উপুড় করে। আর খুব যেন খুশি খুশি ভাব। যেন উৎসবের মেজাজ বর্বর
দলের মধ্যে। তুমুল হট্টগোল। শব্দ এতদূর পৌছয় না, তবে হাত পা নাড়া দেখে অনুমান
করা যায়।

নেমেছে এবার একটু এগিয়ে এদিকে। আমাদের নালাটার কাছাকাছি। কূল এখানে ঢালু
হতে হতে সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। একধারে ঘন জঙ্গল। এমনই বিত্তফায় ভরে উঠল মন!
গা ঘিন ঘিন যাকে বলে। এইখানে আমার চোখের গোড়ায় ওরা করবে নরহত্যা! আমি
বসে বসে দেখব। একটা নয়, তিন তিনটে মানুষ!—না না, এ অসহ্য! বিদ্রোহী হয়ে
উঠেছে হৃদয়। একটা হেস্তনেস্ত আজ করতেই হবে।

পাহাড় থেকে নেমে ফ্রাইডেকে বললাম, চল, আজ ওদের হত্যা করব। খুনের রক্তে
হাত রাঙাব। আমি এ আর সহ্য করতে পারছি না।

ফ্রাইডে বলল, চলুন। আমারও কষ্ট হচ্ছে। এর শোধ তুলতে হবে। যদি মরতে হয়
মরব চলুন।

তখন অস্ত্রগুলো দুজনের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিলাম। একটা পিস্টল দিলাম
ফ্রাইডেকে, আর তিনটে বন্দুক। আমিও নিলাম তাই। মদের একটা পাত্র নিলাম সাথে।
ফ্রাইডের কাঁধে দিলাম মন্ত একটা ঘোলা। তাতে বাকুদ, গুলি, সীসের ছররা—সব মজুত।
ফ্রাইডের উপর নির্দেশ, যেন আমাকে অনুসরণ করে। কখনো আমাকে ডিঙিয়ে যেন আগে
না চলে যায়। আমি না বললে যেন গুলি না চালায়। ফ্রাইডে মাথা হেলিয়ে সম্মতি
জানাল। হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি, কী মনে হতে কম্পাসটাও নিয়েছি সাথে। আর জলের
বোতল। তারপর দীর্ঘের নাম করে রওনা হলাম।

চলেছি জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে—সম্পর্কণে, যাতে আমাদের ওরা না দেখতে পায়।
ভীষণ রাগ তখন শরীরের প্রতিটি রোমকূপে। টগবগ করে ফুটছে রক্ত। পুরানো চিন্তাটাও
মাঝে মাঝে উকি ঝুকি মারছে। তাইতো, হত্যার প্রতিশোধ তুলতে চলেছি হত্যা দিয়ে। এটা
কি ঠিক? কোনো পাপ নেই তো এর মধ্যে? ওরা কি জ্ঞানত কোনো পাপ করছে? হয়ত
না। কিন্তু অমানুষিক এই নরহত্যা, এটাও তো ঠিক নয়। বসে বসে তো আর দেখা যায়
না। প্রতিবাদ একটা না একটা করা উচিত। তা বলে এই ধৱনের প্রতিবাদ? এটাই এক্ষেত্রে
সঠিক। এছাড়া আমার আর কোনো উপায় নেই। স্বাভাবিক নিয়মে এদের যদি বুঝিয়ে
নিবৃত্ত করতে যাই, তাহলে ওরা মানবে না। যদি ছিনিয়ে আনতে চাই বন্দীদের, তবে যুদ্ধ
লাগবে। সেক্ষেত্রে আমাদেরই প্রাণ নাশের সম্ভাবনা। আধুনিক কোনো অস্ত্র ওদের সাথে
নেই ঠিকই, কিন্তু তীর ধনুক তো আছে। নিপুণ ওরা শরক্ষেপণে। সুতরাং অস্ত্র আমাকে

এক্ষেত্রে ধরতেই হচ্ছে। হত্যা করব অহেতুক নয়। হত্যা করার মধ্য দিয়ে তিনজন বন্দীর জীবন রক্ষা করব। সেটা পাপ নয়। এক্ষেত্রে সেটাই মহা পুণ্যের কাজ।

নিঃশব্দে চলেছি। শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনিটুকু অব্দি না ওঠে, সেদিকে আমাদের নজর। ফ্রাইডে চলেছে আমার পিছন পিছন। একেবারে শেষ মাথায় এসে থামলাম। ফ্রাইডেকে বললাম, এই গাছে উঠে দেখ দেখি, স্পষ্টভাবে ওদের দেখা যায় কিনা। উঠল গাছে। ফিরে এল একটু পরেই। বলল, দেখা যায়। আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে মাংস খাচ্ছে। একজন বন্দীকে ইতোমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে। ওরই দেশের লোক এরা। দুই বন্দীর মধ্যে একজন সাদা চামড়া মানুষ। এবার সম্ভবত তার পালা।

তখন লাফ দিয়ে উঠলাম। দেখি সত্যিই তাই। সাদা চামড়ারই বটে। পরনে পোশাক। হাত পা বাঁধা দাঁড় করিয়ে দেখেছে সেইভাবে একধারে। ভোজন পর্ব চলছে। আরেক বন্দী সম্পূর্ণ উলঙ্ঘ। মুখ দেখার উপায় নেই। হাত পা বাঁধা অবস্থায় উপুড় করে শুইয়ে রেখেছে তাকে নৌকোর খোলে। তখন গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

সময় হাতে খুব কম। ইশারা করলাম ফ্রাইডেকে। ঘন ঝোপঝাড়ে যেরা অঞ্চল। অদূরে মন্ত্র এক গাছ। সেটা ওরা যেখানে বসে আছে তার থেকে পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরে। মাটির সাথে শরীর মিশিয়ে অতিক্রম করলাম দূরস্থুকু। এগিয়ে গেলাম। সামনে বড় বড় ঝোপ। শুয়ে পড়লাম মাটিতে। বুকে তখন হাতুড়ি পিটেছে আমার।

এগিয়ে গেছে একদল ইউরোপীয় বন্দীদের দিকে। বন্দুক মাটিতে রেখে নিশানা ঠিক করলাম। ফ্রাইডেকে বললাম, আমি যা করব তুইও তাই করবি। খবরদার, ভুল যেন না হয়। ফ্রাইডেও দেখাদেখি বন্দুক নামাল। নিশানা করল। বললাম, এবার গুলি কর।

আমিও চিপেছি ঘোড়া। ছুটে গেল এক সাথে এক ঝাঁক ছুরু। ফ্রাইডের নিশানা নির্ভুল। দেখি দলের মধ্যে দুজন এক সাথে হুমড়ি থেরে পড়ল বালির উপর, অর্থাৎ খতম। বাকি তিনজন ছিটকে গেল তিনদিকে। তারাও অল্প বিস্তর জন্ম। এদিকে গুলির শব্দে চমকে উঠেছে অন্যান্যরা। ভয় পেয়ে গেছে। ত্রাস যাকে বলে। কোন্দিকে যাবে ঠিক করতে পারছে না। দ্বিতীয় বন্দুক তখন নামালাম। নিশানা করলাম। দেখাদেখি ফ্রাইডেও। এবার হতবিহুল মানুষগুলোকে লক্ষ্য করে নিশানা। বললাম, চালাও গুলি। সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম। অর্থাৎ আমিও ছুড়েছি। ছিটকে পড়ল এবারও দুজন। আহতের সংখ্যা আগেরবারের তুলনায় এবার বেশি। আর সে কী চিংকার! ছুটেছে চিংকার করতে করতে বালির উপর দিয়ে। দরদর করে গা দিয়ে ঝরছে রক্ত। তখন ফ্রাইডেকে বললাম, চল এবার দেখা দিই।

বেরিয়ে এলাম ঝোপের আড়াল থেকে। ফ্রাইডে ধাওয়া করল আহতদের। আমি গেলাম বন্দীর কাছে। বালির উপর পড়ে আছে বেচারি। হতবিহুল ভাব। দেখি চারজন এরই মধ্যে ছুটে ছুটে এসে নৌকায় উঠেছে। ফ্রাইডেকে বললাম, গুলি কর। ছুটে এল একঝাঁক গুলি। ছিটকে পড়ল দুজন জলের মধ্যে। দুজন ভীষণভাবে জন্ম। দেখি সেই অবস্থাতেই চেষ্টা করছে পালাতে। ফের গুলি। মারা পড়ল আরো একজন। চতুর্থ ব্যক্তি নৌকোর খোলে শুয়ে কাঁচরাতে লাগল।

ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে দিলাম বন্দীর। ওঠলাম হাত ধরে। পতুগিজ ভাষায় জিঞ্জেস করলাম তার পরিচয়। জানে না সে ভাষা। ল্যাটিনে বলল সে স্ক্রিপ্টন। তেমন দুর্বল নয় বা মৃচ্ছাও যায় নি। শুধু ঘাবড়ে গেছে ঘটনার পরম্পরায় এই যা। তখন বোতল খুলে দিলাম গলায় ঢেলে পানীয়। একটু চাঙ্গা হল। সঙ্গে রঞ্চি ছিল। দিলাম দুখানা। খেল

গোগ্রামে। আহারে বেচারা, কতদিন বন্দী অবস্থায় ফেলে রেখেছে এইভাবে কে জানে। দেশের নাম জিজ্ঞেস করলাম। বলল স্পেন। আর সে কী শুন্দা জ্ঞাপনের ঘটা ! আমি তার জীবনদাতা। কোনোদিন ভুলবে না আমার ঝণ। তখন যেটুকু জানি ওদের ভাষা, তাহিতে বললাম, এখন আর অন্য কোনো কথা নয়। বিপদ এখনো কাটে নি। লড়তে হবে। এই নিন অস্ত্র। বলে পিস্তল দিলাম, আর সঙ্গে তরবারি। হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যা তেজ ! উঠল তড়াক করে লাফিয়ে। ছুটে গেল আহত বর্বরদের দিকে, এক কোপে চোখের নিম্নে কেটে ফেলল একজনের মাথা। গুলি ছুড়ল। তাতেও মারা পড়ল দুজন। তখন আর পালাতে কেউ পথ পায় না। তিনজন যে আমরা তখন এক দলে ! তিনজনের হাতেই অস্ত্র। ওরা তো অস্ত্রহীন।

আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে এখানে আসা অব্দি একটাও গুলি ছুঁড়ি নি। হাতে আছে বন্দুক। তাতে গুলি তৈরি। শুধু ঘোড়া টিপে ছুটিয়ে দেবার অপেক্ষা। ফ্রাইডেকে বললাম, যা তো চট্ট করে খোপের আড়াল থেকে বাকি বন্দুক কটা নিয়ে আয়। ছুটল ফ্রাইডে সঙ্গে সঙ্গে। নিয়ে এল। ওর আমার দুজনেরটাই। গুলি ভরলাম সে গুলোয় নতুন করে। তরছি গুলি, হঠাৎ দেখি সদ্য মুক্ত বন্দীর সঙ্গে ভীষণ লড়াই লেগেছে এক বর্বরের। হাতে তার



কাঠের খড়গ। আর কী তেজ মানুষটার ! দু দুবার দেখলাম তরবারির আঘাত গিয়ে পড়ল মাথায়, কেটে গেল এই এতখানি, তবু দমে না। হুঞ্চার দিয়ে লাফিয়ে পড়ে নতুন উদ্যমে। পারে কি আর বন্দী তার সঙ্গে। তেমন শক্তি কি তার আছে। দেখি ফেলে দিয়েছে বালির উপর, হুঞ্চার দিয়ে আসছে সে ছুটে উদ্যত খড়গ হাতে, অমনি পিস্তল গর্জে উঠল। লাগল ঠিক বুকের মাঝখানে। আর্ত চিৎকার করে যাচিতে টাল খেয়ে পড়ল। সেই শেষ আর উঠল না।

আর ফ্রাইডেকে যেন পেয়ে বসেছে নেশায়। হাতে অস্ত্র বলতে এখন শুধু কুড়ুল। তাই দিয়ে সে যা যুদ্ধ ! তাড়া করতে করতে নিয়ে যায় একেকটাকে শেষ সীমায়, তখন আর পালাতে পারে না, তাছাড়া দৌড়েও তো ভীষণ পটু। পারবে কে দৌড়ে ফ্রাইডের সাথে।

মুহূর্তে ধরে ফেলে পলায়মান ব্যক্তিকে। তারপর দু দশবার কুড়ুলের এলোপাথাড়ি ঘা।
সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মৃত্যু। তিনজন দেখলাম তাড়া খেয়ে সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়ল। ফ্রাইডেও
পড়ল ঝাপিয়ে। তারপর জলের মধ্যেই একের পর এক কোপ। লাল হয়ে গেল জলের
রং।

ছিল মোট একুশ জন। পরে যদিও এই হিসেব আমরা করেছি তবু এখানে আগে বলে
দিই।

খেপের আড়াল থেকে ছোড়া বন্দুকের গুলিতে নিহত	—৩
ত্বিতীয় দফার গুলিতে নিহত	—২
নৌকোর মধ্যে ফ্রাইডের গুলিতে নিহত	—২
প্রথম বারের আঘাতে জখম, পরে নিহত	—২
প্রথম বারের আঘাতে জখম, পরে জঙ্গলে গিয়ে মারা গেছে	—১
ইওরোপীয় বন্দীর হাতে হত	—৩
ফ্রাইডে তাড়া করে মেরেছে	—৪

মোট —১৭

বাকি চারজন এক ফাঁকে পানসিতে ঢেড়ে দে চম্পট। খেয়াল করি নি আগে। হঠাৎ
নজর পড়তে ফ্রাইডে গেল তেড়ে। গুলি করল। তিনজন চেখের সামনে পড়ল জলে।
ওঠার আর নাম নেই। অর্থাৎ খতম। বাকি একজনকে কিছুতে কায়দা করা গেল না।
ততক্ষণে সে নাগালের বাইরে। গুলি ছুড়লে অতদূর গিয়ে পৌছবে না। ফ্রাইডে বলল,
চলুন আমরাও নৌকো নিয়ে তাড়া করি। উঠলাম লাফ দিয়ে নৌকায়। দেখি তৃতীয় বন্দীটি
উপুড় হয়ে পড়ে আছে পায়ের কাছে। হাত পা বাঁধা। এতক্ষণ ওর কথা আমাদের খেয়াল
হয় নি। তখন তাড়াতাড়ি হাত পায়ের বাঁধন কাটলাম। ভীষণ দুর্বল শরীর। আর অসুস্থ।
হয়ত গুলি গোলার শব্দে বেদম ঘাবড়ে গেছে। ধুকপুক করছে প্রাণটুকু। তাড়া করে খেয়ে
যাওয়া আর হল না। ততক্ষণে সে অনেক দূর। ভারি চিন্তা হচ্ছে। যদি দেশে ফিরে গিয়ে
নিয়ে আসে দলবল। যদি আমাদের আক্রমণ করে! ফ্রাইডে তখনো যাবার জন্যে
বন্ধপরিকর। আমি নিরস্ত করলাম।

তখন নজর গেল বন্দীর দিকে। পর মুহূর্তে দেখি অবাক কাণ্ড ; ঝুকে পড়েছে ফ্রাইডে
তার মুখের উপর। আর কী কান্না, কী আনন্দ ! বন্দীকে জড়িয়ে ধরে চুম্ব খেয়ে নৌকোর
উপরই দেখি তা থৈ তা থৈ নাচ। পরক্ষণে পাঞ্জাকোলা করে নামিয়ে আনল নৌকো থেকে।
চিৎকার করে আমাকে ডাকল। কাছে গেলাম। বলল, এই দেখুন, আমার বাবা। আমার
বাবা ! আমি আমার বাবাকে পেয়েছি ! এই দেখুন এখনো বেঁচে আছে।

ধরাধরি করে এনে শুইয়ে দিলাম গাছের ছায়ায়। পানীয় দিলাম। বড় দুর্বল শরীর।
তখন বাড় উঠেছে। সো সো হাওয়া বেগ। ভাগ্য ভালো নৌকো নিয়ে তাড়া করি নি। সমুদ্রের
জল উঠেছে ফুসে। বললাম, ফ্রাইডে, পানসি দুটো ডাঙায় তুলে রাখি চল। নইলে তেসে
যাবে। তখন তুলে রাখলাম। বাড় আরো বেড়েছে। সঙ্গে চেউ। আমি নিশ্চিত সে নৌকো
নিয়ে পারবে না দেশে ফিরে যেতে। ঝড়ের কবলে পড়তে বাধ্য। সে অবস্থায় সলিল সমাধি
ছাড়া তার গত্যস্তর নেই।

ফ্রাইডের আর তখন অন্য কোনো দিকে খেয়াল নেই। কী যে করবে বাবাকে নিয়ে
বুঝে উঠতে পারছে না। ডাকলাম কাছে। হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল। বললাম,

বাবাকে কিছু খেতে দিয়েছিস? রুটি টুটি? মাথা নাড়ল দুধারে। বলল, নেই কিছু। তখন ঘোলা থেকে বের করে একবানা রুটি দিলাম। এই একটিই আমার সম্বল। কিসমিস দিলাম একমুঠো। আর জল। নিয়ে গেল বাবার কাছে। দিল। দেখি একটু পরে ছুটতে ছুটতে কোথায় চলেছে। মিনিট পনের তার আর পাত্তা নেই। দেখি আসছে তারপর ছুটতে ছুটতে। হাতে জলের একটা পাত্র। অর্থাৎ যেটুকু জল দিয়েছি আমি তাতে ত্ক্ষণ নিবারণ হয় নি। আরো চেয়েছে। তাই ছুটে গিয়েছিল তাবুতে। ফিরে এল জলের পাত্র নিয়ে।

জল খেয়ে সুস্থির হল মানুষটা। বললাম, আর কি জল আছে ফ্রাইডে? বলল, আছে।—তাহলে দে এদিকে, আমরা একটু খাই। দিল পাত্র। খেলাম আমি আর স্পেনীয়। রুটিও এনেছে ফ্রাইডে সঙ্গে করে। অবশিষ্ট কটা স্পেনীয়কে দিলাম। খেল। ভারি ক্লাস্ট তখন। ঝাড় ঝাপটা তো কম গেল না এতক্ষণ ধরে। এবার বিশ্রাম চাই। শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। অমনি ঘূম। কাছে গিয়ে দেখি হাত পা জ্বায়গায় জ্বায়গায় ফুলে উঠেছে। শক্ত বাধনে বাঁধা ছিল কতক্ষণ কে জানে। খানিকক্ষণ পরে ঘূম থেকে তুললাম। দিলাম, এক মুঠো কিসমিস। খুব তৎপৰ সহকারে খেল। আর শুকায় ভক্তিতে যেন তদ্বাত ভাব। কী বলে যে আমাকে ধন্যবাদ জানাবে তার আর ভাষা খুঁজে পায় না। বললাম, শুঠ এবার। এখানে থেকে আর লাভ কী। বাড়ির দিকে যাই। উঠতে আর পারে না। হাতে পায়ে জোর মোটে নেই। ক্লাস্টির ভাব তখনো শরীরের ভাঁজে ভাঁজে। ফ্রাইডেও এসে দাঢ়িয়েছে আমার পাশে। টিপে দিল হাত পা। দলাই মলাই করে দিল। কত যে ভালাবসা ওর মনে! আর কাজ করে, ফাঁকে ফাঁকে ঘাড় সুরিয়ে বাবাকে দেখে। বসে আছে একইভাবে মানুষটা। এখনো বিস্ময়ের ঘোর হয়তো কাটে নি। সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে ফিরে আসা, তা-ও এইভাবে এ ঘেন কল্পনারও অতীত। সেই কথাই বোধহয় ভাবছে এখনো। বললাম, যা ফ্রাইডে, তোর বাবার কাছে যা। অমনি এক ছুটে চলে গেল। সে যে কত খুশি! কত গল্প দুজনের মধ্যে। আমি তো মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছি। একটু পরে বালির উপর হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল বাবা। ফ্রাইডে ফিরে এল। বললাম, তা হ্যারে, একে যে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ইটোবার যে ক্ষমতা নেই। এক কাজ কর। তুই বরং ডোঞ্চা নিয়ে আয়। কূলের ধার থেবে বাইতে নদীর পথ ধরে নিয়ে গেলে চলবে। ফ্রাইডে বলল, ডোঞ্চার দরকার নেই। পানসিতেই হবে। আমি ব্যবস্থা করছি। বলে অবলীলাক্রমে অতবড় মানুষটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বসাল পান্সিতে। বাবাকেও তুলল। তারপর দাঢ় বেয়ে এগিয়ে চলল নদীর দিকে।

আমি ইটাতে ইটাতে, নাক বরাবর এগোলাম। নালার কাছে পৌছে দেখি পানসিও ততক্ষণে হাজির। নামানো হল দুজনকে। ধরাধরি করে নিয়ে চললাম বাড়ির দিকে। কিন্তু পাঁচিল কীভাবে ডিঙ্গেই? সেটা যে আরেক সমস্যা। মই বেয়ে তো আর ধরাধরি করে ওপারে নিয়ে যাওয়া যায় না। তখন ঠিক করলাম, সুস্থ না হওয়া অবি পাঁচিলের বাইরেই তাঁবু খাটিয়ে ওদের থাকার বন্দোবস্ত করব। লেগে গেলাম ফ্রাইডে আর আমি কাজে। দুঃস্থির মধ্যে তাঁবু তৈরি। চারধারে পুঁতেছি চারটে খুঁটি। মাথায় পুরানো পাল। তার উপর কিছু শুকনো ডালপালা। যাতে হওয়ায় উড়ে না যায়। মেঝেয় বিছিয়ে দিলাম পুরু করে খড়। তার উপর কস্বল। পাশাপাশি দুটো বিছানা। গায়ে দেবার জন্যেও দুটো কস্বল দিলাম। এগুলো সব আমার দীর্ঘদিনের সঞ্চয়।

মোটমাট দ্বীপ যথার্থ অর্থে এবার রাঙ্গোর রূপ নিতে চলেছে। একবুনে প্রজ্ঞা অমার তিনজন। আমি তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এরা এক অর্থে আমারই সম্পত্তি। এই দ্বীপের

যেখানে যা আছে সব আমার। এমন কোনো শক্তি নেই যে আমার হাত থেকে এসব ছিনিয়ে নেয়। অর্থাৎ রাজা হিসেবে আমি প্রভৃতি ক্ষমতা সম্পর্ক। সেটা আমার তিন প্রজাও বিশ্বাস করে। ভারি অনুগত তারা। তিনজনেরই জীবন রক্ষা পেয়েছে আমার দৌলতে। এটা তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে এবং সে জন্য কৃতার্থও। যে কোনো মুহূর্তে বিলিয়ে দিতে পারে আমার জন্যে জীবন। ধর্মের ব্যাপারে আমি কারো ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করি না। তিনজনের ধর্ম তিন রকম। ফ্রাইডেকে বলতে পারি আধা খ্রিস্টান। তার বাবা বর্বর ধর্মাচরণে বিশ্বাসী। স্পেনীয় ধর্মমত ভিন্ন। তা নিয়ে অবশ্য নিজেদের মধ্যে তারা কোনো পার্থক্য টানে না। আমিও বিশেষ মাথা ঘামাই না।

তাঁদিনে সুস্থ হয়েছে দুই অতিথি। সর্বাঙ্গীন সুস্থ। স্বাচ্ছন্দে; হাঁটাচলা করে বেড়াতে পারে। ঠাই দিয়েছি তাদের ভিতরের তাঁবুতে। কিন্তু সে তো গেল শুধু বাসস্থানের সমস্যা। খাদ্য সমস্যা যে অবিলম্বে সমাধান করা প্রয়োজন। কদিন অবিশ্বি পরপর কটা ছাগল মারলাম। রাঁধল ফ্রাইডে। খেয়ে তো তারা মুগ্ধ। বিশেষ করে ফ্রাইডের বাবা। তার ছেলে যে এত ভালো রাঁধতে পারে, একথা যেন সে ভাবতেও পারে না।

ফ্রাইডেকে দিয়ে ইতোমধ্যে আরা দুটো কাজ করলাম। বন্দুক কটা পড়েছিল সমুদ্রের তীরে। আনালাম। মৃতদেহগুলো জড়ো করে দাহ করল। এটা আমি হাজার চেষ্টা করলেও পারতাম না। বীভৎস সে দৃশ্য। সার সার পড়ে আছে অতগুলো মড়া। পচন ধরতে শুরু করেছে। সে যা দুর্গম্ব! ধারে কাছে দ্বিসতেও আমার অনীহা। ফলে ফ্রাইডেকেই সব করতে হল।

তা দুশ্চিন্তা কিন্তু পুরোপুরি কাটে নি। সেই যে পালাল একজন—যদি সে দলবল নিয়ে ফিরে আসে। ফ্রাইডের বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম। আমি তো আর তার ভাষা বুঝি না। ফ্রাইডেকেই দিলাম দোভাস্যীর দায়িত্ব। বলল, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। যতদূর অনুমান দেশে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, কেননা ঐ ঝড় এবং ঐ প্রবল টেউ অগ্রাহ্য করে সুস্থভাবে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। যদিবা তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় এগুলো অগ্রাহ্য করে সে ডাঙায় পৌছেছে, তবে বাতাসের যা গতি, স্বদেশে ফেরা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তার পানসি গিয়ে ভিড়েছে দক্ষিণের কোনো দ্বীপে এবং ডাঙায় ওঠামাত্র নরখাদক হিংস্র জন্তুর মুখে পড়ে তার এতক্ষণে পক্ষত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। এ সবই অনুমান যদিও, তথাপি একেবারে যে ভিত্তিহীন তা নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় ভিত্তি এর নেই, এবং সব রকম বাধা অগ্রাহ্য করে সে দেশে পৌছুতে পেরেছে, তথাপি ঐ যে আমার মনে সংশয়—সে দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, এটা অসম্ভব। ঘটনার আকস্মিকতায় সে বীতিমতো বিভ্রান্ত। সঙ্গীদের ঘৃত্যার কারণ হিসেবে দেশে গিয়ে বলবে, তারা ঘরেছে বজ্জ্বাঘাতে। গুলি ছুড়বার সঙ্গে সঙ্গে যে আগুনের ঝলক বেরয় সেটাকে ওরা বজ্জ্বাপাত বলেই ধরে নিয়েছে। নিজেদের মধ্যে হতবিহুল অবস্থায় এই সব কথা বলাবলি করছিল। এটা ফ্রাইডের বাবা নিজের কানে শুনেছে। ফ্রাইডে এবং আমাকে ধরে নিয়েছে স্বর্গের দেবদূত। কেননা এই দ্বীপে যে অমিত শক্তিধর কোনো মানুষ থাকতে পারে এটা তাদের কল্পনার বাইরে। ফিরে গিয়ে নির্ঘাঁ সে সেই কথাই বলবে। আর দেশের মানুষ কি এত বোকা যে দেবদূতের বিরুদ্ধে, ঝড় আর বজ্জ্বের বিরুদ্ধে আসবে তীর ধনুক নিয়ে লড়াই করতে! অতএব আমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণই নেই।

মোটামুটি যুক্তি নির্ভর কথা। বেশ মনে লাগল। বাস্তবেও যাচাই করে নিলাম তার সত্যতা। এল না কেউ। রোজই সতর্ক দৃষ্টিতে চারধারে কল জরিপ করি। দেখা মেলে না

কোনো নৌকো কি কোনো ঘানুষের। হয়ত ধরে নিয়েছে তারা, এই দ্বীপে আসার অথবা হল বেনামুকির রোধ-নজরে পড়া এবং তার পরিগতি ঘৃত্য। কে আর চায় যেচে ঘৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে !

স্পেনীয় অতিথির কাছে শুনলাম, লা প্লাটা থেকে ঢলেছিল তারা হাভানার দিকে। পথে ঝড়ের কবলে পড়ে। সবাই উদ্ধার পায় নি। মাত্র সতের জন নৌকোয় করে উঠেছে গিয়ে ঐ দ্বীপে। মোটের উপর বর্বরদের সাথে মিলে মিশে সুখেই আছে। জাহাজে ছিল চামড়া আর রূপার পসরা। কথা ছিল মাল খালাস করে ফেরার সময় নিয়ে আসবে নানান পণ্য সামগ্রী। কিন্তু বিধি বাম। পড়তে হল এই দুর্ভোগের মুখে।

সঙ্গে পতুর্গিজ কজন নাবিকও আছে। এরা তাদের জাহাজের লোক নয়, অন্য আরেক জাহাজের। সে জাহাজও বিপর্যস্ত, উদ্ধার করতে প্রেরেছিল তারা মাত্র এই পাঁচজনকে। বাকি সবাই ঘারা গেছে। সেই পাঁচজনকে নিয়ে মোট সতেরজন। তারাও দ্বীপে বহাল তবিয়তে আছে।

কয়েকটা বন্দুক ছিল সাথে। থাকা না থাকা এখন সমান। কেননা বারুদ নেই। একটা টেটাও নেই। জলে ভেসে গেছে বারুদের পিপে। সামান্য যেটুকু ছিল তা বন্দুকে। তা দিয়ে অচেনা অজানা দ্বীপে প্রথম কদিন চলেছে খাদ্য অর্থেশণের প্রচেষ্টা। তারপর সব শেষ। এখন ফেলে দিলেও কিছু যায় আসে না।

বললাম, তা তোমরা পালাবার চেষ্টা কর নি? বলল করেছে চেষ্টা। তবে সবই মুখে মুখে। অর্থাৎ আলোচনা যাকে বলে। কার্যত কিছুই করা সম্ভব হয় নি। পালাবার জন্যে নৌকো বা খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদি দরকার। কোথায় পাবে সে সব। শুধু হাতে সমুদ্রে ভেসে পড়ার অর্থই হল যেচে ঘৃত্যুবরণ। কেউই সেরকম কোনো প্রস্তাবে রাজি হয় নি।

বললাম, বেশ তো, আমি যদি একটা প্রস্তাব দিই। যদি সবাই মিলে এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করি। বলল, আপনি কীসের। বলুন না কী আপনার প্রস্তাব।

বলব কি বলব না তাই নিয়ে নিজের ঘনেই বিষ্ণুর দ্বিধা। আগে ঠিক করতে হবে একটা ঘন্ট বড় ব্যাপার। ওদের সকলকে যদি এখানে আনি, পালাবার যাবতীয় সুযোগ করে দিই—তখন যদি আমাকে ফেলে ওরা পালায়। বিশ্বাস-ঘাতকতায় স্পেনীয়দের তো জুড়ি নেই। মোটমাট আমার কর্তৃত্ব আগাগোড়া বজায় থাকবে। এমন নয়, আমি ওদের হাতের ক্রীড়নক। ওরা আমার দয়ায় আমার সহায়তায় পালাতে পারবে এটা ওদের সদা সর্বদা মনে রাখতে হবে। তার পরেও কথা আছে। আমাকে হয়ত নিয়ে গেল স্পেনে। সেখানে আমি শুনেছি, ইংরেজ কাউকে দেখলে ওরা বলি দেয়, দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করে। হবে না তো সেরকম? সেটাও আগে ঠিক করে নিতে হবে। যদি ওদের তরফ থেকে আশ্বাস পাই তবে আমার যা যন্ত্রপাতে আছে তাই দিয়ে সবাই মিলে তৈরি করব বজরা, সঙ্গে খাবার দাবার প্রচুর থাকবে। থাকবে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যাবতীয় উপকরণ। তখন কাজ শুধু দিনক্ষণ দেখে সবাই মিলে ভেসে পড়া। নিরাপদে কূলে যে পৌছুতে পারব, এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওদের হয়ে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কোনোরকম বেচাল ওরা করবে না। করবার মতো অবস্থা বা শক্তি থাকলে তো? বন্দুকের কথা তো একটু আগেই বললাম। অকেজে কতগুলো খেলনাসামগ্রী, মনোবল বলতে কিছুই আর নেই। এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়েছে, সেখানে অতিকষ্টে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাটাই বড় কথা। মনোবল সেখানে কোনো উপকারে আসে না। পালাতে পারলে এখন

সবাই বাঁচে। কী ভাবে পালাবে বা কার সাহায্যে সেটা ওদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। এটা ঠিক, কাউকে না কাউকে নির্ভর করে তবে পালানো সম্ভব হবে। তার প্রতি তাদের শুল্কাই থাকবে বরং এবং ক্রতজ্জ্বতা। এর কোনো ব্যত্যয় হবে না।

বলল, বেশ তো, এত কিছুর পরও যদি আপনার মনে ভরসা না জন্মায়, তবে এক কাজ করা যেতে পারে। আমি আর ফ্রাইডের বাবা দ্বীপে ফিরে যাই। কথা বলে আসি ওদের সাথে। জবাব শুনে আসি। মানবে কি মানবে না বা আপনার সাথে কোনোরকম ছলনা করার চেষ্টা করবে কিনা সেটা স্পষ্ট বলতে বলব। শুধু বললেই হবে না, ঈশ্বরের নামে শপথ নিতে হবে। সেটা যদি করে তখন এসে বলব আপনাকে তাদের মতামত। তারপর যা করণীয়, আপনি নির্দেশ দেবেন। আমি সেই মতো করব।

বলে সে নিজে আমার সামনে ঈশ্বরের নামে শপথ করল—কোনোদিন আমার অবস্থাননা করবে না, আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। আমাকে প্রভু বলে ঘানবে। আমার জন্যে প্রয়োজনবোধে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পিছপা হবে না।

একই ভাষায় বাকিরাও করবে শপথ। সে বলল বড় দৃঢ়বজ্ঞক তাদের অবস্থা। মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সৎ এবং বিশ্বাসী। কারোর মনে কোনো ঘোর-প্যাচ নেই। নেই বলেই তো পড়ে আছে ঐখানে ঐ অবস্থায়। পরনের একফালি ন্যাকড়া অঙ্গি নেই। ক্ষুধার অন্ন নেই পেটে। সবই বর্তরদের দয়ার উপর। অত্যাচার করে না তারা ঠিক। কিন্তু করতে কতক্ষণ! একটু বেচাল করলে কি আর রক্ষে রাখবে। আমাকে বলল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি কথা দিলাম।

তখন ঠিক করলাম পাঠাব দুজনকে দ্বীপে। ঘুরে আসুক যত দ্রুত সম্ভব। আর আমি দেরি করতে চাই না। কথাবার্তা বলে মোটামুটি সম্মতিটুকু নিয়ে আসুক। শুধু সম্মতিই বা বলি কেন, সম্ভব হলে অমনি নিয়ে আসুক নোকোয় করে সকলকে। তারপর এখানে বসে সবাই মিলে মতলব ঠিক করা যাবে।

ঠিকঠাক যখন সব, দু চার দিনের মধ্যেই তারা রওনা দেবে—হঠাতে বেঁকে বসল সে। কিছুতেই যাবে না। আমি যত বোঝাই যত বলি সব নির্বর্ধক। সেই এক গো তার—যাবে না এখন, কদিন যাক। তারপর যাবে। সে এক অস্তুত পরিস্থিতি। তলিয়ে বিচার করে দেখি, আপনি যে করছে, তার পিছনে কোনো রকম মতলব বা দুরভিসংজ্ঞ নেই। আবার পরে সময় সুযোগ হলে যে যাবার কথা বলছে, সেটাও ঐকান্তিক। একটু খাদ নেই তাতে। ফলে ছামাস দেরি হল। ঘটনাটা পুরো ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করি।

তা মাসখানেক তো হল এসেছে এই দ্বীপে, মোটের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখিয়েছি এখানকার। মাঝ আমি কীভাবে থাকি, কী আমার খাদ্যখাদ্য, কীভাবে করি চাষবাস, কর্তৃকু আমার সঞ্চয়—কিছুই বাদ দিই নি। সেটা বর্তমানের চারজনের পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়। দেখে শুনে নিজেই মাথা নাড়ল। বলল, না না, এ অবস্থায় আমার সাধীরা যদি আসে, তবে মুশকিল। কী করে কুলোবে? তাছাড়া এতগুলো মানুষ যে রওনা হব, সঙ্গে তো প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য নেবার দরকার হবে। সেটাই বা আসবে কোথেকে? বরং এক কাজ করি, এই বর্ষায় বেশি করে জমিতে চাষ দিই। তাতে ফলন প্রচুর হবে। বীজের তো আর অভাব নেই। বেশির ভাগ সঞ্চয় করব যাত্রার জন্যে। বাকিটা লাগবে খেতে। এ সবের ব্যবস্থা না করে আগে থাকতে অতগুলো মানুষকে আনলে কি অসুবিধেয় পড়তে হবে না।

কথাটা ঠিক। আন্তরিকতায় এতটুকু অভাব নেই। সব দিক বিবেচনা করেই বলা। এ

ব্যাপারে আমারও যথেষ্ট দুশ্কিন্তা ছিল। বললাম, বেশ তো, তবে তাই হোক। আগে বাদ্যের সংস্থান করে তবে নয় যাওয়ার কথা ভাবা যাবে।

তখন চারজনে আটহাত নিয়ে লেগে পড়লাম ফসল ফলাবার কাজে। জমি আরো বাড়লাম। কাঠের তৈরি তো সব্যস্ত্রপাতি—দেখি ফ্রাইডে আর তার বাবা ভীবণ ওস্তাদ এই কাজে। এক মাসের মধ্যে জমি চৰা শেষ। একসাথে জড় করলে সে মন্ত এক মাঠ। একটি আগাছা নেই। নেই একটি কাঁকর কি পাথর। শুধু ঝুরো মাটি, আর যথেষ্ট গভীর। তাতে মোট বাইশ বুশেল যব আর ঘোল ঝুড়ি ধান ছড়িয়ে দিলাম। তারপর বৃষ্টি হল। খাই খরচা বাবদ যে দানা, তার বেশিরভাগটাই দিয়েছি বীজ শস্য হিসেবে। সঞ্চয় এখন বলতে গেলে শূন্য। তা প্রথম বর্ষার জল পেয়ে অঙ্কুর গজাল। প্রায় প্রতিটি দানা থেকেই গজিয়েছে অঙ্কুর। সে যা আনন্দ আমাদের! এখন আর কি—আপেক্ষা কেবল। অঙ্কুর থেকে চারা হবে, তাতে ফল ধরবে, পাকবে। সে কি দু চার দিনের কাজ!

চুপচাপ বসে থেকে তো আর লাভ নেই, বজরা বানাতে হবে। সেটা একটা মন্ত বড় ব্যাপার। দলবল মিলে বেরিয়ে পড়লাম। এখন আর ভয় কীসের আমাদের! দলে রীতিমতো ভারি। অস্ত্র আছে—সর্বদা হাতের নাগালে; যদি একান্তই আসে বর্বরের দল—ঠেকাব প্রাণপণে, লড়াই করব। সেই মন নিয়েই যত্নত্ব স্বচ্ছে ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে গাছ দেখলাম পরপর বেশ কয়েকটা। খুব মোটা। ফ্রাইডে আর তার বাবাকে দেখালাম, বললাম, কাট এর যে কোনো একটা। কটা শুরু হল। অচিরেই মন্ত গাছ পপাত ধরণীতলে। স্পেনীয়কে বললাম ওদের কাজ দেখান্তা করতে, দরকার মতো প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে। অবশ্য তার দরকার বিশেষ নেই। ওরা দুজন একাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। দেখতে না দেখতে চিরে ফেলল গাছ করাত দিয়ে। বেরুল বিশাল আকৃতির তত্ত্ব। এক একখানা প্রায় পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা, দু ফুট চওড়া আর সোয়া দু ফুট মতো পুরু। তাই দিয়ে তখন বজরা তৈরির কাজ শুরু হল।

এদিকে আমিও কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। খামার নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছি। সংখ্যা বাড়তে হবে। একদিন ফাঁদ পেতে নতুন কটাকে ধরলাম। বেশির ভাগই বাচ্চা। ছানা পোষাই এখন আমাদের দরকার। বড় হবে দ্রুত। গায়ে গতরে যথেষ্ট মাংস হবে। মাংসটা যে এখন খুব প্রয়োজন। পাশাপাশি আঙুর শুকিয়ে কিসমিস করার কাজও চলছে। ইতোমধ্যে আশি পিপে মতো শুকিয়ে রেখেছি। আরো দরকার। সঠিক ভাবে কটা লাগবে আমাদের সে কি ছাই জানি! যাই করি না কেন মনে হয়, কম পড়ে যাবে। তখন তড়িঘড়ি যাতে কম না পড়ে তার ব্যবস্থা করি।

দেখতে দেখতে ফসল কটার সময় এসে গেল। যব ধান দুইই পেকেছে। কটিতে হবে এবার। আট হাতে ফের একসাথে লেগে গেলাম। তারপর ঝাড়াই মাড়াই। ওস্তাদ মানুষ বটে ফ্রাইডের বাবা। কী নিপুণ যে হাতের কাজ। ঝাড়াই মাড়াই সে-ই বলতে গেলে করল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখলাম। তা সব মিলিয়ে বাইশ বুশেলের মতো যব, আর সেই পরিমাণ চাল। চিন্তা কীসের। আসুক না ওরা ঘোলজন। দুবেলা পেট পূরে খাওয়াবার এখন হিস্মৎ রাখি। তারপরেও যথেষ্ট মজুত থাকবে। সেটা হবে আমাদের যাত্রার অন্যতম রসদ।

কিন্তু নেব কীসে করে, সেটও এক সমস্যা। ঝুড়ি যা ছিল তাতে এখন আর কুলোবে না। তখন নতুন করে ঝুড়ি বোনার পালা। এ ব্যাপারে দেখলাম স্পেনীয় ভারি ওস্তাদ। টকাটক বানিয়ে ফেলল বেশ কটা ঝুড়ি। তাতে ফসল তুলে রেখে দিলাম।

এবং আর দেরি করা ঠিক নয়, এবর রওনা হতে হবে। স্পেনীয় আর ফ্রাইডের বাবা যাবে দীপে। আমি আর ফ্রাইডে এখানে থাকব। শুভক্ষণ দেখে রওনা হল। যাবার আগে মনে করিয়ে দিলাম কী কী শর্ত, কোন্ কোন্ ব্যাপারে তাকে শপথ আদায় করে আনতে হবে। দেখলাম মনে আছে সব হ্রবহ। একটা কথা শুধু যোগ করে দিলাম। বললাম, এই যে প্রতিশ্রূতি ওরা দেবে, সেটা কিন্তু লিখিতভাবে দেওয়া চাই। কলম কাগজ আমি যোগাড় করে দেব। তাতে রাজি হল। তখন রওনা হতে অনুমতি দিলাম।

আকাশ বেশ পরিষ্কার। ঝকঝক করছে রোদ। সমুদ্র শান্ত। কুয়াশার লেশ মাত্র নেই কোনোখানে। উঠে বসল দুজন। সেই পানসিতে যাতে করে বন্দী অবস্থায় এসেছিল ওরা দীপে। আমরা হাত নেড়ে বিদায় জানালাম। চলে গেছে যখন অনেকটা দূর, তখন হঠাতে খেয়াল হল—এই যা, কবে নাগাদ ফিরবে সেটা তো জিজ্ঞেস করা হল না।

সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি নানান জিনিস। একটা করে বন্দুক দুজনের হাতে, সেই সাথে বারুদ আর ছুরু। বলা আছে প্রচণ্ড প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন ভুলেও বন্দুকের সাহায্য না নেয়। মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই এই বন্দুক। একে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলে অসুবিধে পড়তে হতে পারে।

বিশ্বর খাদ্যদ্রব্যও তুলে দিয়েছি সাথে। রুটি, হাতে গড়া কেক, ঝুঁড়ি বোঝাই কিসমিস—আরো কত কী। সারা দীপের লোককে প্রয়োজন বোধে কিসমিস বিলোতে পারবে। চাই কি রুটিও। মেটিমাটি আয়োজনে কোনো ঝুটি নাই। বলা আছে, ফেরার সময় একটু আগে থেকে বন্দুক ছুড়ে আমাদের যেন জানান দেয় তারা ফিরছে।

সেটা অঙ্গোবর মাস। তারিখ সঠিকভাবে কত আমি বলতে পারব না। তারিখের হিসেব তো আজকাল আর রাখি না। সেই গোলমাল হয়ে যাবার পর থেকে। শুধু মাসের হিসেবটা আকাশ দেখে বুঝতে পরি। সেই সাথে ক বছর কাটল আমার দীপে সেটাও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

আটটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। এই আট দিনে কত যে পরিকল্পনা আমার! কত দুষ্টিভা দুর্ভাবনা। কী হয় কে জানে। কী সংবাদ নিয়ে আসে ওরা তারই বা ঠিক কী। যদি রাজি না হয় বাকি নাবিকের দল! যদি আমার চোখের আড়ালে কোনো ঘেট পাকায়! আবার এমনও হতে পারে। দীপে যাওয়া মাত্র ফের ওদের বন্দী করা হল। তারপর সুলুক সন্ধান জেনে বাঁকে বাঁকে মানুষ প্রতিশোধ নেবে বলে এল এখানে! তখন উপায়? কীভাবে আত্মরক্ষা করব তাদের রোধের হাত থেকে? বন্দুকে কি আর তখন কাজ হবে?

জানি না এমনধারা হয়ত আরো কত কী ভাবতাম। কোথায় কোন সুদূরে ভাসিয়ে দিতাম আমার কল্পনার ভেলা। হঠাতে ন দিনের দিন। ভোর তখন। ঘুমে তলিয়ে আছি আমি গুহার বিছানায়। ফ্রাইডের ডাকে এক লাফে ঘুম ভেঙে উঠে বসলাম।

—মালিক, মালিক, ওরা এসেছে। শিগগির উঠুন! বুকে তো আমার পড়ছে হাতুড়ির ঘা। ভীষণ উদ্বেগ। অমনি হড়মুড়িয়ে উঠলাম গিয়ে পাহাড়ের মাথায়। সঙ্গে যে অস্ত্র আনব তাড়াহড়োর মাথায় সেটাও মনে নেই। দূরবীন নেই। তবে খালি চোখেই সব নজরে পড়ছে। কুল থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা নৌকো—কোনো জাহাজেরই নৌকো বলে অনুমান হয়—কূলের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। তাতে অনেক যাত্রী। বেশির ভাগই নাবিক। খুব ভালো করে দেখলাম। কই চেনা তো লাগছে না কাউকে! সেই স্পেনীয় কোথায়! কোথায় ফ্রাইডের বাবা। তাছাড়া এদের খোশাক আশাক ধোপ দুরস্ত। এরা কারা

তবে ?

ফাইডেকে বললাম, নড়াচড়া করিস নে। আগে দেখে নি ওরা আমাদের বঙ্গু না শক্ত। তারপর কী করব ঠিক করা যাবে।

বলে চুপিসাড়ে পাহাড়ের আড়ল দিয়ে নেমে নিয়ে এলাম দূরবীন। উঠলাম সবচেয়ে উচু স্থানে। পরিষ্কার দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। দেখি দূরে একখানা জাহাজ। নোঙর ফেল। কুল থেকে প্রায় ক্রেশ খানেক দূরে। ধরন দেখে মনে হয় আমারই দেশের জাহাজ। এমনকি নৌকোর নাবিকরাও ইংরেজ।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব। আর মনের গভীরে খুশির ঝিলিক। তবে কি মুক্তি এবার আসম ! আমাকে মুক্তি করে নিয়ে যেতে এসেছে আমারই দেশের মানুষ। ইচ্ছে হয়, বাঁপ দিয়ে পড়ি জলে, সাতার কেটে চলে যাই ওদের নৌকোর কাছে। আমার পরিচয় দিই। ওদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি দ্বীপে। কিন্তু না, এত ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই। ধৈর্য এখানে অসম্ভব প্রযোজনীয়। আর প্রতীক্ষা। দীর্ঘ সাতাশ বছরের নির্জনতা আমাকে এই দুটি বিশেষ গুণ শিখিয়েছে। আগে বুঝতে হবে সব কিছু। দেখার এখনো অনেক বাকি। অনুধাবন করতে হবে। তবে না উচ্ছাস ! তবে না ছুটে যাওয়া কি জলে বাঁপ খেয়ে পড়া !



তবু কেন জানি না, মনের মধ্যে অঙ্গুত একটা বিপদের সঙ্কেতও টের পাচ্ছি। এটা সকলেরই হয়। এ হল নিছক অনুভূতির ব্যাপার। আচ্ছা, এরা তো হত্যাকারীও হতে পারে, কিংবা দস্যু ! আসছে হয়ত দ্বীপে তেমনই কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে। কিংবা হয়ত এমনও হতে পারে, আবিষ্কার করতে বেরিয়েছে নতুন কোনো দেশ। এসে পড়েছে এখানে। সেক্ষেত্রে এই নির্জন নিরালা পরিবেশে আমাকে হঠাতে দেখলে পারবে তো সহজ ভাবে নিতে ? অবাক হবে না বা ঘাবড়ে যাবে না ? আমাকে ভয়ে বিস্ময়ে হত্যা করার চেষ্টা করবে না তো ?

যদি তেমন কিছু ঘটে, তবে আমি অসহায়। সামনে আমার গভীর সৎক্ষট। এ অবস্থায় আগে কখনো পড়ি নি। এরা শিক্ষিত। এরা অস্ত্রধারী। সভ্য দুনিয়া থেকে এসেছে। পারব

কীভাবে আমরা কটা পাখি যারা বন্দুক আর বাকুদের পসরা নিয়ে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ?

নৌকো এসে কূলে লাগাল। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ভাগ্য ভালো, বেশি দূর এগোল না। বালির উপর তুলে রাখল নৌকো। নামল। আমি যেখানে তার থেকে প্রায় আধ মাইল দূর। নালাটা নজরে পড়ে নি। জানি না, তবে হয়ত নালা দিয়ে সরাসরি ঢুকিয়ে দিত নৌকো। নামত আমার আস্তানার কাছে। দেখতে পেত পাঁচিল। গুহার অস্তিত্ব আবিষ্কার করত। সেই সাথে আমার অস্তিত্বও। তারপর আর কি ? নির্বিচারে লুটপাট। গুলি গোলা। আমি কি এঁটে উঠতে পারব ওদের চালাকির সঙ্গে ?

তবে ইংরেজ সবাই নয়, দুজন সন্তবত ওলন্দাজ। সন্তবত এই কারণে বলছি কেননা আমার দূরবীনে মুখের আদল সেরকমই লাগছে। মোট এগার জন। তিনজন বাদে সকলেরই হাতে অস্ত্র। অর্থাৎ বন্দুক। নৌকো থামার সাথে সাথে চারজন নামল কূলে লাফ দিয়ে। অস্ত্রহীন তিনজনকে হ্যাচকা টান মেরে নামাল। তবে কি বন্দী এরা ? প্রশ্নটা হঠাৎ মনের গভীরে বিলিক দিয়ে উঠল। এখনি কোনো সিদ্ধান্ত নয়। আগে দেখার প্রয়োজন আছে। ঐতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ধৰ্মথর্মে মুখের ভাব একজনের। যেন কত না বিষণ্ণ। কাতর অনুরোধ জানিয়ে কী যেন বলার চেষ্টা করছে। শুনছে না অস্ত্রধারীর দল। বাকি দুজন উর্ধ্বে তুলে ধরেছে হাত। যেন ঈশ্বরের কাছে করুণ প্রার্থনা। —প্রভু, তুমি এর বিচার করো ! কিন্তু কীসের বিচার ? তবে কি ওরা এদের হত্যা করবে ?

চমক ভাঙল ফ্রাইডের প্রশ্নে। অবাক হয়ে গেছে সে-ও। চোখে মুখে বিস্ময় বিমুক্ত ভাব। বলল, মালিক, ইংরেজরাও কি আমার দেশের মানুষদের মতো মানুষের মাংস খায় ? রীতিমতো চমকে উঠলাম। বললাম, হঠাৎ এ প্রশ্ন করার অর্থ ? বলল, তাই তো দেখতে পাচ্ছি। ঐ তিনজনকে ওরা খাবে।

বললাম, খাবে না। ওরা ওদের হত্যা করবে।

তখনো মধ্যে আমার দ্বিধা দোদুল্যতা। এদের উদ্দেশ্য আমার অনুমানের বাইরে। তবে সৎ যে নয় এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। কু মতলব নিয়ে এসেছে। হঠাৎ দেখি একজনের হাতের তলোয়ার বিলিক দিয়ে উঠল। শুন্যে তোলা তার হাত। অস্ত্রহীন একজনের ঠিক মাথার উপর। বুকের রক্ত আমার হিম। ওকে কি এখুনি খুন করবে ? আমার চোখের সামনে ! চোখ বুজলাম। একটু পরে দেখি, করে নি খুন। মাথার উপর থেকে তলোয়ার নামিয়েছে। আর ভয়ে বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেই বন্দী। হয়ত আসম মতুযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করে আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

ইস থাকত যদি এখন সেই স্পেনীয় আর ফ্রাইডের বাবা ! আমি কি স্থির ভাবে এখানে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম ! চারজনে মিলে চলে যেতাম ঘোপের আড়ালে। আকস্মিক গুলিতে চমক ধরিয়ে দিতাম। ঘরত হয়ত দু একজন। বাকিরা ভয় পেত। তখন মুক্ত করে আনতাম তিনজনকে।

একটু পরে দেখি বসেছে তিনজন বালির উপর। আর বাকিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতস্তত। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে চারধার। নতুন একটা জায়গায় বেড়াতে এলে যেভাবে মানুষ ঘুরে ঘুরে সব দেখে। আনন্দে ডগমগ তাদের হাবভাব। শুধু তিন বন্দীর মুখে বিশাদের ছায়া। বিরস বদনে বসে আছে সমুদ্রের দিকে চেয়ে।

মনে পড়ছে পুরানো দিনের কথা। সেই স্মৃতি। দ্বীপে আমার প্রথম দিন। অবাক হয়ে এইভাবেই বসে ছিলাম আমি। আমারও চোখের দৃষ্টিতে এই হতাশা। আর কত ভয় ! মনে

আছে প্রথম রাতটা কাটিয়েছিলাম গাছের উপর উঠে। আতঙ্ক তখন। যদি নিচে থাকলে হিংস্ব জানোয়ার এসে গিলে থায়। সে যেন দৃঢ়স্বপ্নের দিন আমার। দৃঢ়স্বপ্নের এক একটি মুহূর্ত।

তবে একবারে যে নিরাশা তা নয়। জাহাঙ্গিটা ভাঙা অবস্থায় পড়েছিল আদূরে। সেটা আমার কাছে বিরাট এক আশার ব্যাপার। সেই আশায় ভর করেই তো যেতে সাহস পেলাম পরদিন। তারপর ফের। তারপর আবার, আবার। তবেই না সংগ্রহ করে আনলাম জীবনধারণের যাবতীয় সরঞ্জাম। এই গুলি গোলা বারুদ বন্দুক খাদ্য, এরই উপর নির্ভর করে, বলতে গেলে এখনো বেঁচে আছি।

আর ওদের সামনে ভারি জমাট অঙ্ককার। আশার বিদ্যুমাত্র ঝিলিকও নেই। নির্জন নিরালা একটা দ্বীপ। জানে না এর অঙ্কিসক্ষি। জানে না এখানে কোথায় কী রহস্য আছে লুকায়িত। হিংস্ব জন্ত আছে কি নেই সেটাও জানে না। সব মিলয়ে অস্তুত এক অনিশ্চয়তা। তারই ধোঁয়াটে ছায়া মেঝে মলিন মুখে বসে আছে।



বালির ওপর তুলে রাখল নৌকা

জানি না আমার মতো এরাও ইন্দ্রের উপর নির্ভর করে কিনা। অন্ন বশ্ত্র দাত, জগদীশ্বর। এই বিশাল বিশ্বের নিয়ন্তা। যদি বিশ্বস থাকে ইন্দ্রে, তবে আমারই মতো সাহসে বুক বাঁধতে পারবে। আমারই মতো পারবে ধৈর্য দিয়ে সময় দিয়ে প্রতিটি সমস্যা মোকাবিলা করতে। তবে আর অনিশ্চয়তার মেঝে জয়বে না মনের কোণে। তবে সব সমস্যার নিরসন হবে।

দেখতে পাচ্ছি ওদের গোটা দলটাকেই। এসেছে ঢেউ ওঠার আগেই। সমুদ্র এখন মোটামুটি শাঙ্ক। একটু পরেই উঠবে বাতাস। তখন চঞ্চল হবে। জানে নির্যাত ওরা প্রতিটি খুঁটিনাটি। বন্দীদের নির্বাসনে রেখে এখনি নিশ্চয় ফিরে যাবে না। তাতে বিপর্যয়ের সন্তাবনা। বাতাস পড়ে যাওয়া অঙ্গি অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ সেই বিকেল। ততক্ষণ ঘূরে ঘূরে দেখবে চারধার। কোথায় কীরকম জায়গায় নির্বাসন দিয়ে গেল বন্দীদের সেটা অনুমান করার চেষ্টা করবে।

একটু পরে দেখি নাবিকের দুজন গিয়ে নৌকোয় উঠল। একটু যেন নেশাগ্রস্ত ভাবে। টলছে পা, শুয়ে পড়ল পাটাতনে। তারপর ঘূম।

অর্থাৎ হাতে আমার প্রায় দশ ঘণ্টার মতো সময়। এই দশ ঘণ্টায় দ্বিপ ছেড়ে ওদের পক্ষে জাহাজে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। সে চেষ্টাও তারা করবে বলে মনে হয় না। রওনা হতে হতে সেই সঙ্গে। সেটা আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গল। কেননা অঙ্ককারে আমাদের যে দেখতে পাবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই। সে অবস্থায় আরো নিকটস্থ হতে পারব। বন্দুক থাকবে হাতের গোড়ায় প্রস্তুত। মোটমাট মনে মনে যুদ্ধের প্রস্তুতি আমি নিয়ে ফেলেছি। মরণজয়ী এ লড়াই। তিনটি প্রাণীকে উদ্ধার করার জন্যে যুদ্ধযাত্রা। শুধু সেটাই বড় কথা নয়। এই সমগ্র ঘটন অঘটনের পিছনে একটা কারণ আছে। তার রহস্য ভেদ করার জন্যেই আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে। তাতে স্বজাতির প্রাপ্ত যাক কিছু পরোয়া নেই। জয়ী হতে পারলে জাহাজে করে দেশে ফেরার একটা চেষ্টা করতে হবে। আশ্চর্য, এই সহজ সরল কথাটা একক্ষণ মনে উদয় হয় নি! আমি তো এরমারা উদ্ধারও পেতে পারি। একবার চেষ্টা করব নাকি?

ফ্রাইডেকে সাবধান করে দিলাম। যেন সূর্য ডোবার আগে কোনো কিছু না করে। হাতে এখনো অচেল সময়। আর বেলা বাড়ছে একটু একটু করে। আমাদের যাওয়া দাওয়া মায় দৈনন্দিন কাজ সব পঞ্চ। তাকিয়ে আছি একই ভাবে। দেখতে দেখতে দুপুর। গনগনে রোদ। সূর্য লাফ দিয়ে মাথার উপর উঠল। আর কি পারে রোদের প্রচণ্ড তাপ অগ্রাহ্য করে ঘুরে ঘুরে দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে বেড়াতে। প্রচণ্ড কাহিল তখন। শুয়ে পড়ল আটজন গাছের ছায়ায়। সেই নৌকোর ঘূমস্ত নাবিকটিও এক ফাঁকে উঠে এসেছে। বন্দী তিনজনও বসেছে এক গাছের ছায়ায়। মোটমাট কাউকে আর এতদূর থেকে দেখা যায় না। গাছের আড়ালে সবাই ঢাকা পড়ে গেছে।

তখন নামলাম পাহাড়ের মাথা থেকে। যেখানে বসে বা শুয়ে আছে ওরা সেটা এখান থেকে পোয়া মাইল মতো দূর। ঘন জঙ্গল। আর বিস্তর ঝোপঝাড়। ইচ্ছে করছে যাই চুপিচুপি, অস্তত কে ওরা, কী ওদের ঘতলব সেটা একবার জেনে আসি। আমি তো আর কথা বলব না ওদের সাথে, ওরা নিজেরা নিজেরা কিছু না কিছু বলবে, আমি আড়ি পেতে শুনব। শুনে তবে তো সেই মতো ব্যবস্থা! আগে থেকে কিছু না জেনে নিছক অনুমানের উপর নির্ভর করে কি আর কিছু সিদ্ধান্ত টানা যায়।

রওনা দিলাম। সে ভাবি নিঃশব্দ নিশ্চুপ। ফ্রাইডে আসছে পিছু পিছু। বলেছি খবরদার এতটুকু শব্দ যেন না হয়। কিছুতে আমাদের কিন্তু দেখা দেওয়া চলবে না। অস্ত্র দুজনের হাতেই তৈরি। কোমরেও ঝোলানা পিস্তল আর তরবারি। আরো দুটো করে বন্দুক দুজনের পিঠে। তাতে গুলি বারুদ আর সীসে ভরা।

ভাগ্য ভালো, আরো খানিকটা এগিয়ে দেখি সেই তিনজন। বিরস বদন। শোয় নি কেউ, বসা। এ অবস্থায় পারে কি কেউ নিশ্চিন্তে শুয়ে বিশ্রাম করতে! অস্তত আমার অনুমান যদি ঠিক হয়। দেখি ওরা বেশ খানিকটা দূরে। যাবখানে জঙ্গল আর ঝোপ ঝাড়। তখন পা টিপে টিপে আরো কাছে গেলাম। বলতে গেলে হাতের নাগালে তিনজন। ফ্রাইডে ঠিক আমার পাশে তারপর গলার স্বর যতদূর সন্তব নামিয়ে স্পেনের ভাষায় বললাম, কে আপনারা? কী পরিচয়?

অমনি চমকে উঠেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আমাদের। যেন মানুষ নই আমরা, ভূত। ভূত দেখলে যেমন হয় সেরকমই চোখ মুখের ভাব। মুখ চুপ। যেন ভুলে গেছে কথা

বলতে। হয়ত এখুনি উঠে দোড় দেবে। তখন ইংরিজিতে বললাম, ভয় নেই। আমাকে দেখে অবাক হবেন না। আমি আপনাদের বন্ধু। আমার উপর নির্ভর করতে পারেন।

তখন একজন বলল, আপনি কি দেবদৃত?

বললাম, না, আমি মানুষ।

—কিন্তু আমাদের যা অবস্থা এ তো মানুষের এক্ষিয়ারের বাহিরে।

বললাম, মানুষ স্টৈশ্বরেরই প্রেরিত জীব। আপনি বলুন, কেন আপনারা এখানে? আপনাদের পরিচয়।

বলল, আমাদের অনন্ত বিপদ।

বললাম, জানি। যখন নৌকা থেকে নামলেন আমি দেখেছি। একজন আপনাকে মারবে বলে তরবারি তুলেছিল। আপনার প্রতিবাদ করার সাহসটুকুও হয় নি।

তখন কান্না। সে যা চোখের জল! বিমোহিত অবস্থা তখন। আমাকে ধরেই নিয়েছে স্টৈশ্বরের প্রেরিত কোনো দৃত। মাথার টুপি খুলে আমাকে সম্মান জ্ঞাপন করল।

বললাম, আমি স্টৈশ্বর নই। দেবদৃতও নই। আমি আপনারই মতো বক্ষমাংসে গড়া একজন মানুষ। স্টৈশ্বর যা দেবদৃত হলে আমার পরনে স্বাভাবিক পোশাক থাকত। এগুলো ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি। এই কোমরের বেল্ট অব্দি। সে অনেক ইতিহাস। পরে সন্তুব হলে শোনাব। বর্তমানে এইটুকু শুনে রাখুন আমি ইংরেজ। এখানে এসেছি আপনাদের সাহায্য করতে। ও আমার সহচর। আমাদের সাথে বন্দুক আছে। নির্ভয়ে বলুন এবার কি আপনাদের সমস্যা।

তখন বলল, তবে সংক্ষেপে বলি। ওরা খুনী। বেশি কিছু বলার হয়ত সময় পাব না। ঐ জাহাজের আমি কাপ্টেন। ওরা নাবিক। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আমাকে হয়ত খুনই করত। শেষে কী মনে করে নিয়ে এসেছে এখানে। এই নির্জন নিরালা দ্বীপে। আমাদের নির্বাসিত করবে। ও আমার সহকারী। আর উনি একজন যাত্রী। এরা বিদ্রোহের প্রতিবাদ করেছিল। তাই এই শাস্তি। জানি না ভাগ্যে কী আছে।

বললাম, ওরা কি সবাই ওখানে?

—হ্যাঁ। শুয়ে আছে। বিশ্রাম করছে। বিকেল নাগাদ ফিরে যাবে জাহাজে। আমার ভয় করছে। যদি ওরা শুনতে পায় আমি কথা বলছিলাম আপনার সঙ্গে তবে হয়ত আর আন্ত রাখবে না। খুন করে ফেলবে।

—কটা বন্দুক আছে ওদের সাথে?

—দুটো। আর তলোয়ার।

বললাম, বেশি বাকিটা তাহলে আমার উপর ছেড়ে দিন। যা করার আমি করব।

করণীয় এখন দুটো। হত্যা করতে পারি একধারসে সবাইকে, নয়ত বন্দী করতে পারি। দ্বিতীয়টাই আমার বেশি মনঃপূত। কিন্তু করব কীভাবে।

কাপ্টেন বলল, দুজন আছে দলে তারা মারাত্মক। ভীষণ নিষ্ঠুর। করতে পারে না এমন কাজ নেই। যদি এই দুজনকে শায়েত্তা করা যায়, তবে বাকিরাও শায়েত্তা হবে। সুড়সুড় করে কাজে গিয়ে যোগ দেবে।

বললাম, কারা তারা দেখিয়ে দিন।

বলল, এতদূর থেকে তো দেখানো সন্তুব নয়। পরে সুযোগ পেলে আমি চিনিয়ে দেব।

বললাম, যা আমি করতে বলব করবেন?

বলল, একশাবার। আপনার প্রতিটি আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

বললাম, তবে আর একটু ওধারে চলুন। কথা আছে। ফন্দী অঁচতে হবে। যাতে শুনতে না পায় ওরা সেই ব্যবস্থা আগে করা যাক।

তখন অতি সন্তর্পণে আমরা পিছিয়ে এলাম। জঙ্গলের আরো কিছুটা গভীরে। নিরাপদ এখন। অস্তত শোনা তো দূরের কথা, আমাদের দেখতেও আর পাবে না।

বললাম, একটা পশু গোড়াতেই করে নিই। আপনাদের আমি জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিলাম। কিন্তু দুটি শর্তে। আপনারা কি কোনোরকম শর্ত মানতে প্রস্তুত?

বলল, নিশ্চয়। জীবনের বিনিময়ে যে কোনো শর্তে তারা রাজি। তাদের জাহাজ, তারা তিনজন সব এর পর থেকে আমারই কর্তৃত্বে আসবে। অর্থাৎ আমি যা বলব তাই আক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তারা সকলে। এর এতটুকু অন্যথা হবে না।

বললাম, তথাপি শর্ত দুটি প্রকাশ্যে বলে রাখার প্রয়োজন আছে। প্রথম শর্ত এই দ্বিপে যে কদিন বা যতদিন আপনারা থাকবেন, আমার নির্দেশ না মেনে কোনো কাজ করতে পারবেন না। যদি আমি আপনাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিই—তবেই পারবেন অস্ত্র ব্যবহার করতে। নিজের খেয়াল খুশিতে নয়। এককথায় দ্বিপে থাকাকালীন আপনারা আমারই একান্ত অনুগত।

বিত্তীয় শর্ত: যদি জাহাজ উদ্ধার করতে পারি তবে আমার লোকজন সমেত আমাকে জাহাজে করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে। এর অন্য ভাড়া বাবদ কোনো খরচ আপনি দাবী করতে পারবেন না। এখন তেবে বলুন, এই দুটি শর্তে আপনাদের কোনোরকম আপত্তি আছে কিনা।

মেনে নিল সব। সে যে কত ভাবে কত কথায় আমার প্রতি নিঃশর্ত আস্ত্র জ্ঞাপনের চেষ্টা! আমি অভিভূত। বললাম, ঠিক আছে। আমি আপনাদের মনোভাব বুঝতে পেরেছি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। এই নিন তিন জনের জন্যে তিনটে বন্দুক। এতে গুলি বারুদ ভরা আছে। এবার চলুন ওরা যেখানে আছে সেখানে যাই। যদি ঘুমিয়ে থাকে আমাদের পক্ষে মঙ্গল। সেই অবস্থাতেই এক সাথে পাঁচজন গুলি ছুড়ব। কেউ হয়ত মারা যাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা নিরূপায়। মারবার ইচ্ছে আমাদের নেই। তবে একজনের মত্ত্য যদি বাকিদের প্রভাবিত করে, যদি আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। সেক্ষেত্রে সেটাই সবচেয়ে ভালো।

কাণ্ডেনেরও দেখলাম একই ধরনের ইচ্ছে। শুধু সেই দুই পাষণ্ডকে নিয়ে অত্যন্ত ভাবিত। তারা যথার্থ পক্ষে দুষ্ট প্রকৃতির। তারা যদি মরে তবে তার বিন্দুমাত্র দুঃখ কি ক্ষেত্রে নেই।

বললাম, সেটা অবস্থা বুঝে ঠিক করা যাবে। ঘটনা যেমন হবে সেই মতো আমরা কাজ করব, সিদ্ধান্ত নেব। আপাতত চলুন এগোই। আর দেরি করা ঠিক নয়।

বলে এগোতে যাব, দেখি একজন সুম থেকে উঠেছে। তারপর আরো একজন। দেখতে পাচ্ছি তাদের এখান থেকে স্পষ্ট। বললাম, এই দুজন কি সেই পাষণ্ড? বলল না। এরা নয়।—তবে এদের আমরা এতটুকু ক্ষতি যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখতে পারি। আমি বললাম, কিন্তু তা বলে কারোর ক্ষতি হবে না, গায়ে একটু আঁচ লাগবে না এটা ভাবলে কিন্তু মুশকিল। সেক্ষেত্রে আমাদের পরিকল্পনা কার্যকরী হবে না।

তখন এগোল তারা তিনজন। আমি আর ফ্রাইডে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা পিস্তলও দিয়েছি কাণ্ডেনকে। খানিক দূর গিয়ে তিনজনের মধ্যে একজন হাতে তালি দিল। তাতে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল সদ্য জাগ্রতদের একজন। চিৎকার করে ডাকল বাকিদের। ততক্ষণে

বন্দুক গঞ্জে উঠেছে। নির্ভুল নিশানা। লুটিয়ে পড়ল একজন মাটিতে তৎক্ষণাৎ। বাকি জন যথেষ্ট আহত। ছিটকে পড়ল মাটিতে। কিন্তু পর মুহূর্তেই উঠে দাঢ়াল। ডাকল প্রাণপণ চিংকারে সবাইকে। কাণ্ডেন এগিয়ে গেল। হাতে উদ্যত আগ্রেয়াস্ত। বলল, এবার সিংহরকে ডাক। বলে বন্দুকের কুণ্ডো দিয়ে মারল তার মাথায়। মুহূর্তে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে আরো তিনজন। বন্দুকের ছররার আঘাতে তারাও অল্পবিস্তর জখম। আর দেরি করা ঠিক না। তখন আমি আড়াল থেকে প্রকাশ্যে এলাম।

অবাক তারা। স্তন্ত্রিত। সব জারিজুরি মুহূর্তে খতম। আতঙ্কে চোখ ছানাবড়া। সেই অবস্থায় হাঁচু গেড়ে বসে পড়ল সামনে। ক্ষমা প্রার্থনা করল। কাণ্ডেন বলল, ক্ষমা করতে পারে, তবে এক শর্তে। সিংহরের নামে প্রতিজ্ঞা করতে হবে দুশমনদের সঙ্গে হাত মেলাবে না এবং সেই সাথে দুশমন কর্তৃক অধিকৃত জাহাজ পুনরুদ্ধারের জন্যে যা যা করণীয় সব করতে হবে। জাহাজ জামাইকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্বও তাদের। তারা কি রাজি? বলল, রাজি। জীবনের বিনিময়ে তারা সব কিছু করতে রাজি। আমরা তাদের উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করতে পারি।



বলাবাহল্য, শুধু মুখের কথার উপর নির্ভর করা যায় না। বিশেষ করে একটু আগে যাদের ওরকম মারমুখী চেহারা। আমরা তাই সব দিক বিবেচনা করে তাদের হাত পা বেঁধে বালির উপর ফেলে রেখে দিলাম।

ফাইডে আর কাণ্ডেনের সহকারীকে পাঠালাম নৌকোটার দিকে। বললাম, পাল দাঢ় হাল সব যেন খুলে নিয়ে আসে। গেল তাই। ইতোমধ্যে দেখি আরো তিনজন গুটি গুটি আমাদের সামনে হাজির। কী ব্যাপার, কী চাই তোমাদের? বলে বন্দুক তুললাম। অঘনি হাত জোড় করে সে কী অনুনয় বিনয়! হকচকিয়ে গেছে তো কাণ্ডেনকে দেখে। সঙ্গে আবার আমার মতো একটা অচেনা মানুষ। কিছুক্ষণ আগের বন্দী এখন থেকে বন্দুক হাতে তাদেরই উপর খবরদারি করার জন্যে দণ্ডায়মান। বলল, আমাদের দয়া করুন। জীবন

হানি ঘটাবেন না। আমরা আপনার হয়ে সব কিছু করতে রাজি।

তখন তাদেরও হাত পা বাঁধলাম। ফেলে রেখে দিলাম প্রথম কজনের পাশে। আমরা বিজয়ী এটা এখন নিষ্ঠিয়ায় বলা যায়। সব কটি শক্রই পর্যন্ত। বলতে গেলে খুব সামান্য রক্তপাতেই এতবড় বিজয় পর্ব সমাধা হল।

নিরবিগ্ন এখন। বসলাম আমি আর কাণ্ডেন মুখোমুখি। পরম্পরের খবরাখবর নিতে। প্রথমে বললাম আমি আমার নিজের কথা। শুরু থেকে এই দীর্ঘ সাতাশ বছরের ইতিহাস। একাগ্র মনে শুনল। আর ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ে বিমৃঢ় ভাব। বিশেষ করে গোলবারুদ রক্ষার ইতিবৃত্ত শুনে তো রীতিমতো হতবাক। আর সত্য বলতে কি তার মতো মানুষের পক্ষে এতটা ভাবাও যে কষ্টকর। পারবে কীভাবে সুখী সুস্থ মানুষ ক্ষণে ক্ষণে এবংবিধ রোমাঞ্চকর অসুস্থ ঘটনাবলী ভাবতে! শুনে শুন্ধায় সৌজন্যে বিগলিত ভাবে বলল, আপনি না থাকলে এই শয়তানরা আমাকে মেরে ফেলত। আমি হলফ করে বলতে পারি। বলে কাঁদতে লাগল।

তখন সাজ্জনা দিলাম। তাকে আর তার সঙ্গী দুজনকে নিয়ে গেলাম আমার আস্তানাম। খাদ্য দিলাম। পানীয়। দেখালাম ঘূরিয়ে ঘূরিয়ে সবকিছু। দেখে তো তাজ্জব। যেন কথা সরে না মুখে। আর ক্ষণে ক্ষণে সে কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সে কী তারিফ!

বিশেষ করে ঐ যে লোকচক্ষুর আড়াল—ঐ চারপাশে ঘন গাছগাছালি, আমি বিশ বছর আগে লাগিয়েছি গাছ, বড় হয়েছে এতদিন ধরে, এ তো আর ইংল্যান্ড নয় যে ধীরে ধীরে গাছ বাড়বে, এখানে খুব দ্রুত এর বৃদ্ধি, কুঞ্জ বলতে যা বোঝায়—বলল, এটা ভারি চমৎকার। আপনি এইভাবে নিজেকে চারদিক থেকে আড়াল করে যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। তখন হাসতে হাসতে বললাম, এত দেখেছেন। একটা, এর চেয়ে আরো গোপন আরো লুকায়িত আমার আরেকটা বাড়িও আছে। সেটাকে আমি বলি বাগান বাড়ি। রাজা বাদশাদের যেমন থাকে। সেটা পরে দেখব। তবে এখন আমাদের কাজ হল কীভাবে জাহাজটা উদ্ধার করা যায় তার একটা ফলী বের করা। আপনি কী কিছু ভেবেছেন?

বলল, আমি ভাবব কী! আমার তো কিছুই মাথায় খেলছে না। এখনো ছাবিশজন বিদ্রোহী নাবিক জাহাজে রয়েছে। ওরা কি আর সহজে আমাদের শর্ত মেনে নেবে? জানে যে মেনে নেবার হাজারো বিপদ। চক্রস্তর অভিযোগে ইংল্যান্ডে ফিরে গেলে প্রত্যেকের ফাঁসি অন্তি হয়ে যেতে পারে। কে আর চায় সুস্থ শরীর ব্যস্ত করতে। মোটমাট, ওরা কিছুতে ছেড়ে কথা বলবে না। সে অবস্থায় কী যে আমাদের করণীয় আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

কিন্তু তা বলে তো আর বসে থাকলে চলে না। দ্রুত যাহোক একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্রুত এই কারণে কেননা দেরি করলে ঘোর বিপদ। কিছু ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। জাহাজে যারা আছে, তারা যখন দেখবে তাদের সাকরেদেরা ফিরে আসছে না তখন ভিতরে ভিতরে ভীষণ চঞ্চল হবে। কী হল তাদের দেখার জন্যে এখানে আসবে। নির্যাং ভালো যে কিছু ঘটে নি সেটা অনুমান করেই আসবে। সঙ্গে থাকবে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র। সে অবস্থায় আমাদের মুখোমুখি পড়ে যাবারই সম্ভাবনা যথেষ্ট এবং তার অর্থ আমাদের পরাজয়। কেমন করে আমরা চারটে মানুষ পেরে উঠব ছাবিশজন সশস্ত্র মানুষের সঙ্গে!

বললাম, আপাতত এই মুহূর্তে একটাই করণীয়। তা হল কূলে ওদের যে নৌকোটা পড়ে আছে, তাকে অকেজো করে দেওয়া। ফুটো করে দেব নিচে। তাতে জল উঠবে।

নৌকো নিয়ে জাহাজে ফিরে যেতে পারবে না।

স্টেই করলাম। নৌকোয় উঠে যা সব জিনিস ছিল আগে নিয়ে এলাম। যেমন কটা বন্দুক। পানীয়ের বোতল। কিছু বিস্কুট। বাকুদের একটা প্যাকেট। চিনি অনেকখানি। আর এক বোতল ব্রাণ্ডি। এর মধ্যে ব্রাণ্ডি আর চিনি পেয়ে সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম। সাতাশ বছর এই দুটি জিনিসের স্বাদ পরখ করার সুযোগ হয় নি। হয়ত ভুলে গেছি খেতে কীরকম লাগে।

মালপত্র নামিয়ে নৌকোর খোলে করলাম মস্ত একটা ফুটো। নিশ্চিন্ত এখন। যদি অন্য নৌকোতে করে আসে এখানে এবং আমাদের যুদ্ধে পরাজিত করে বন্দী করে, সে অবস্থায় সবাই মিলে একটা নৌকোয় করে জাহাজে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। দ্বীপে কাউকে না কাউকে রেখে যেতেই হবে। তখন কী করা সম্ভব স্টো চিন্তা করে বের করতে হবে।

তবে অন্য একটা ব্যবস্থাও ওরা নিতে পারে। যদি ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারে সঙ্গীরা পড়েছে বিপদে, সে অবস্থায় তাদের ফেলে রেখেই জাহাজ নিয়ে ওরা রওনা হয়ে যাবে। ভুলেও দ্বীপের দিকে আসার চেষ্টা করবে না। যদি সেরকম বুঝি তখন কী করব আমরা? মনে পড়ল তখন স্পেনীয় নাবিকদের কথা। দলে মোট সতের জন। খবর দিয়ে তখন নয় তাদের ডেকে আনব। আর যদি ইতোমধ্যে এসে পৌছয় তবে তো কথাই নেই। হল তখন মোট বাইশজন। ফাইডের বাবাকে ধরে। বাইশজন পারব না কি ছাবিশটা দুশ্মনের সাথে পাঞ্চা দিতে?

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঠেলে ঠেলে নৌকোটাকে ডাঙার উপরে তুললাম। নিরাপদ দূরত্ব বলা যায়। প্রবল স্রোতও পারবে না ভাসিয়ে নিয়ে যেতে। ভারি ক্লান্ত তখন চারজনই। বসে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ শুনি জাহাজ থেকে গুলির শব্দ। যতদূর অনুমান নৌকোর উদ্দেশে সঙ্কেত ধ্বনি। দূরবীন লাগালাম চোখে। দেখি ফের ছুড়ল গুলি। ফের। কিন্তু নৌকোর তো এক চুলও নড়ার নাম নেই। তখন দেখি কজন মিলে কি জলপনা কল্পনা হল। এক জন নির্দেশ দিল আরেকটা নৌকো জলে নামাতে। নামাল স্টো জলে। উঠল তাতে মোট দশজন। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমি। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। আসছে সোজা এই দিকেই।

প্রতিটি মুখ এখান থেকে বলতে গেল স্পষ্ট। চিনতে বা বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হয় না। চেনে তো কাণ্ঠেন সকলকে। আমাকে চিনিয়ে দিল একে একে। —ঐ যে দেখছেন তিনজন, ঐ পাশাপাশি, ডানদিকে—ওরা নির্দোষ। ভালো মানুষ বলতে যা বোঝায়। তবে নিরুপায় এই শয়তানদের হাতে পড়ে। জোর করে ওদের বাধ্য করেছে আমার বিরুদ্ধে চক্রস্তে অংশগ্রহণ করতে। বাকিরা সব বদমাশ।

বদমাশই বটে। মুখ দেখে চেনা যায়। রুক্ষ দুর্বিনীত গোছের ভাব। চোখে সারা রাজ্যের হিংসা আর শয়তনী। গায়ে শক্তি থাকুক আর না থাকুক, হাতে আছে অস্ত্র আর মনে বিদ্বেষ। এই দুটোকে সম্বল করে লড়বে আমাদের সাথে ঘরিয়ার মতো। আমরা কি পারব?

কিন্তু সেকথা তো আর বলা যায় না। তাতে হতাশ হয়ে পড়বে কাণ্ঠেন। বললাম, এই যে আসছে ওরা, কী করবেন এখন বলুন। বলল, আপনি যা বলবেন তাই। বললাম, স্টো তো নির্ভরশীলতার কথা। আপনার জীবন রক্ষা করেছি বলে কি আপনি ভাবছেন আমি দুর্বর? আমার অসীম ক্ষমতা আছে? বলল, তাহলে কী করণীয় এখন? বললাম, একটা কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। যে দশজন আসছে তাদের মধ্যে যারা সৎ-প্রকৃতির

তাদের আমি এতটুকু আঘাত করতে চাই না। সে অবস্থায় তারা পরে আমাদেরই দল ভারি করবে। কিন্তু যারা দুশ্মন, তাদের সঙ্গে কোনো আপোষ নয়। হয় এসপার নয় ওসপার। দরকার হলে জান নেব। যদি মরতে হয় তা-ও সহ। তবু ছাড়ব না কাউকে।

বেশ মনঃপূত হয়েছে আমার কথা। দেখি চোখে মুখে খুশির বিলিক। কিন্তু বসে থাকা তো চলবে না। আসছে ওরা। আমাদের যা করণীয় এই বেলা করে ফেলতে হবে। লেগে পড়লাম অমনি কাজে।

বন্দীরা একইভাবে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। সবচেয়ে আগে ওদের সরাতে হবে। দুজনকে পাঠিয়ে দিলাম ফ্রাইডের সাথে। বদমাশ এরা। কাপ্টেন বলল, বড় অসৎ স্বভাব। তিনজনকে রেখে এলাম গুহায়। ভিতর দিকের ঘরে। সেটা একই সঙ্গে নিরাপদ এবং নিরিবিলি। চিৎকার চেঁচামেচি করলেও কেউ শুনতে পাবে না। অবিশ্যি কাপ্টেন যা বলল তাতে এরা গোলমাল পাকাবার লোক নয়। মোটের উপর শান্ত প্রকৃতির। দলে পড়ে হালফিল বদমায়েশী শিখেছে। সাধান্য ভয়-ডরও দেখালাম। —দেখ বাপু, পালাবার চেষ্টা যদি কর, নিজেরাই বিপদে পড়বে। শান্তি সেক্ষেত্রে মৃত্যু। গুলি করে একেকটাকে খতন করব। আর যদি চুপচাপ থাক, দু তিনদিনের মধ্যে ছাড়া পাবে। এটা মুখের কথা নয় প্রতিজ্ঞা। এই দ্বিপের অধিকারী যেহেতু আমি, আমার প্রতিজ্ঞার নড়চড় হবে না। বলে খাবার দাবার হাতের কাছে ধরে দিলাম, জল দিলাম। বলল, আমরা প্রতিশ্রূতি দিচ্ছি, ভুলেও পালাবার চেষ্টা করব না। আপনার দয়ায় আমরা নিজেদের সঁপে দিয়েছি। হ্যাঁ, আলোও দিলাম। একটা মোমবাতি। আর সকলের অজ্ঞাতসারে ফ্রাইডেকে দাঁড় করিয়ে রাখলাম গুহার মুখে। অর্থাৎ প্রহরী। এতৎসত্ত্বেও যদি কোনোরকম বেগড়বাই করে, ফ্রাইডে তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

ফ্রাইডের হাতে দিয়েছিলাম যে দুজনকে, তারা খাবার দাবার কিছু পেল না। এমনকি গুহার একটু আচ্ছাদনীও না। আমার আস্তানার একটু দূরে খোলা মাঠে পিছমোড়া করে হাত পা বাঁধা অবস্থায় তাদের ফেলে রাখা হল। এরা যেহেতু শয়তান, এটাই তাদের উপযুক্ত শান্তি।

দেখেশুনে দুই বন্দীর অবস্থা তো কাহিল। কত অনুনয় বিনয়, কত আর্জি। বললাম, বেশ, তবে আমাদের কথা শুনবে এই প্রতিজ্ঞা কর। জিশ্বরের নামে কসম খাও। তাই করল। তখন বাঁধন খুলে দিলাম। বলল, আপনারা যদি মরতে বলেন তা-ও আচ্ছা, তবু জানব সৎকাজের জন্যে লড়াই করে যাবেছি। আমরা আর ওদের দলে নেই। তো হলাম একুনে চার। আর তিনজন তো আগেই প্রতিশ্রূতি দিয়ে বসে আছে। সব মিলিয়ে সাত। সবাইকে ভাগ করে দিলাম বন্দুক আর বারুদ। সশস্ত্র এখন। গোটা দলের নেতৃত্ব আমার হাতে। আর যা ঘনের জোর আমাদের—আসুক না দশ কি বিশ জন, হাসতে হাসতে পারব তাদের মহড়া নিতে।

নামল এসে কুলে। লাক দিয়ে পড়ল একে একে দশজন। নৌকো টেনে তুলল বালির উপর। এটা আমার পক্ষে মঙ্গল। কেননা আমি ভেবেছিলাম হয় তো নোঙর ফেলে জলের উপরই রাখবে। সেক্ষেত্রে নোঙর তুলে ভেসে পড়া অনেকখানি সময়ের ব্যাপার। দুতিনজনকে দাঁড় করিয়ে রাখল নৌকোর কাছে পাহারায়। বাকিরা ছুটে গেল প্রথম নৌকোটার দিকে।

অর্থাৎ সেই যে বন্দীদের নিয়ে এসেছিল নৌকো। আমরা তো আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছি। দেখে তা অবাক। —একি, এ যে ফুটো! দেখি কী যেন বলা বলি করছে

নিজেদের মধ্যে।

তারপর ডাঙার দিকে মুখ ফিরিয়ে চিংকার করে ডাক দিল। সঙ্গীদের উদ্দেশে ডাক। ফিরে এল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে। সাড়া কেউ আর দেয় না। তখন একসাথে অনেকগুলো বন্দুক দাগল। গুড়ম গুড়ম—সে যেন এক ঝাঁক গর্জন। সেটা নিষ্ফল। যতদূর অনুমান দূজন ঘাত্র শুনেছে সেই আওয়াজ। যারা পড়ে আছে খোলা ঘাঠে। কিন্তু শুনে লাভ কী। সাড়া দিলে তো আর এরা শুনতে পাবে না। উঠে যে চলে আসবে এদের সহায়তা করতে তারও উপায় নেই। আর গুহার মধ্যে যে তিনজন তারা তো যাবতীয় শ্রবণের বাইরে। অতগুলো দরজা ভেদ করে কিছুতে পৌছবে না তাদের কানে গুলির আওয়াজ।

ফলত তারা অবাক। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ চোখ মুখ। কিংকর্তব্যবিমৃত ভাব। কী যেন আলোচনা করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দেখি হুড়মুড়িয়ে উঠল গিয়ে নৌকায়।

কাণ্ডেন তো থ। আমাকে কেবল বলে একি হল, চলে যাচ্ছ যে ওরা। হয়ত ভেবেছে সঙ্গীরা সকলেই নিহত। সে অবস্থায় জাহাজে ফিরে গিয়ে বাকিদেরকে বলবে, ওরা কেউ বেঁচে নেই, চল আমরা এবার নোঙ্গর তুলে রওনা দিই। তাতে ওদের বরং লাভ, আমাদেরই ক্ষতি। গেল তো জাহাজ। আমরা তো নির্বাসনেই পড়ে রইলাম।

চিন্তাটা যে আমার মাথাতেও নেই তা নয়। তবু ধীর স্থির আমি। অত চঞ্চল হলু আমার চলবে কীভাবে! আমি না এখন নেতো! তা বসে রইলাম একইভাবে। দেখি একটু পরে নৌকা নিয়ে আবার কূলের দিকেই ফিরে আসছে। জানি না কী মতলব। তবে দেখলাম, তিনজনকে নৌকায় বসিয়ে রাখল। বাকিরা চলল বনবাদড় ডিঙিয়ে সঙ্গীদের পাস্তা লাগাতে। অর্থাৎ গিয়ে যে বলবে সকলেই মারা গেছে, এটা অনেকের মনঃপূর্ত হয় নি। জাহাজের বাকি লোকেরা তাতে ওদেরকেই সন্দেহ করবে। সেটা ওরা অনুমান করতে পেরেছে।

আমরা তো উভয় সঙ্কটে বলতে যা বোঝায় তাই। কী করি এখন! কোনদিকে যাই! যদি গিয়ে ডাঙার ঐ সাতজনকে ঘায়েল করি, তবে এদিকের তিনজন নৌকো নিয়ে পালাবে। জাহাজে গিয়ে জানিয়ে দেবে সব, নোঙ্গর তুলে অঘনি ওরা সটকে পড়বে। তাতে আমাদের উদ্ধারের আশা বরবাদ। বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো তখন সাতটা পেট বাঢ়ল। মারতে তো আর পারব না এদের সকলকে। তখন নাও এদের জন্যে চাষবাষ থেকে মায় রান্নাবান্না, বাসন ঘোওয়া শুরু কর!

কী করণীয় তাহলে?

মন বলল, ধৈর্য ধর। দেখ অগ্রপশ্চাং সব কিছু বিবেচনা করে। তারপর সিদ্ধান্ত নাও।

অতএব বসে রইলাম চুপচাপ।

সাতজন গেল পাহাড়ের দিকে। সেই পাহাড়ের নিচেই আমার বসতি। বাকি তিনজন নৌকোটাকে নিয়ে গেল বেশ খানিকটা দূরে। তারপর নোঙ্গর ফেলে অপেক্ষা করতে লাগল।

সাতজনকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। চলছে গা যেঁষাঁষ্যি করে। ঘনে নিদারণ ভয়। উঠবে পাহাড়ের মাথায়। সেটা একপক্ষে ভালো। আমাদের কাছাকাছি হতে হবে। গুলির নাগালের মধ্যে। তখন প্রয়োজনবোধে গুলি চালিয়ে কটাকে জখম করতে পারব।

আর যদি পাহাড় থেকে নেমে দূরে কোথাও যায়, সেটাও আমাদের পক্ষে মঙ্গল। যথেষ্ট

সময় এবং সুযোগ পাব তখন এই তিনজনকে কাবু করার। মনে প্রাণে সেটাই চাই।

উঠল পাহাড়ের মাথায়। ঘুরে ঘুরে দেখছে চারদিক। দূরের দিকেই নজর। তাই পায়ের গোড়ায় আমার বসতি দেখতে পাচ্ছে না। দেখার মনও বোধ হয় নেই। ডাকাডাকি শুরু করল বন্ধুদের নাম ধরে। রীতিমতো চিৎকার। কিন্তু কে দেবে সাড়া! হতাশা তখন নেমে এল ধীর পদক্ষেপে। একটা গাছের নিচে বসল। ঘুমোবে নাকি? সেই যেমন আগের দল ঘুমিয়ে পড়েছিল? তবে আর পায় কে আমাদের! অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ে বন্দী করব সবাইকে। কিন্তু না, ঘুমোবার ধারকাছ দিয়েও গেল না। ভয় যে মনে। আর ত্রস্ত শক্তি ভাব। কোন দিক থেকে বিপদ আসবে বলতে তো কেউ পারে না। সেই মন নিয়েই থম মেরে বসে রইল।

কাণ্ঠেন বলল, আমার মাথায় একটা মতলব খেলছে। ওরা হয়ত একটু পরে ফের বন্দুক ছুড়ে দলবলকে জানান দেবার নতুন একটা চেষ্টা করবে। ইতোমধ্যে আমরা যদি ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাই, তবে নতুন করে বন্দুকে বারুদ পুরবার আগে অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ব ওদের উপর, এতটুকু রক্তক্ষরণ না করে সকলকে বন্দী করব।



ডাঙ্গার দিকে মুখ ফিরিয়ে চিৎকার করে ডাক দিলো

মতলব হিসেবে চমৎকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওরা বন্দুক ছুড়ল না। তখন হতাশ হয়ে নতুন চিন্তা করতে বাধ্য হলাম। ফলী একটা এসেছে মাথায়। কিন্তু সেটা দিনমানে কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সঙ্গে ঘনাক। ততক্ষণে যদি তারা নৌকোয় গিয়ে ওঠে, তবে আমরা যে সফল হব এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সে যেন ধৈর্যের রীতিমতো পরীক্ষা। বসে আছি একভাবে। নড়চড়া বন্ধ। অস্থি হচ্ছে। আর ভয় যদি সঙ্গের আগেই ওরা রওনা হয়ে যায়! সেটা অবিশ্য না হবারই সন্তান। কেননা স্নোত শান্ত হতে হতে সঙ্গে কাবার। তবে যদি মরিয়া হয়ে স্নোত অগ্রাহ্য করে ওরা আগে ভাগে রওনা হয়, সেটা আলাদা কথা।

করল তাই। যা ব্যতিক্রম সেটাই আপাতত ওদের কাছে বিধি, উঠে পড়ল হঠাত। এদিকে সন্ধেও প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। ঘোর ঘোর ভাব। এগোচ্ছে কূলের দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা যাকে বলে হতভম্ব। কিন্তু কী করা যায়? এ অবস্থায় যেমন করে

হোক ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে। কিছুতে চলে যেতে দেওয়া উচিত নয়। উঠলাম গোপন
জায়গা থেকে। কাপ্তেনকে নিয়ে গেলাম ফ্রাইডের কাছে। বললাম, এক কাজ কর। তুই
আর কাপ্তেনের এই সহকারী—দুজন মিলে চলে যা সেই নালাটার কাছে। সেখান থেকে
ইাক দে। এমন ভাবে যেন ওরা শুনতে পায়। ওরা ধরে নেবে ডাকছে ওদের হারানো
সঙ্গীরা। সেক্ষেত্রে যাবে না ওরা, ফিরে আসবে।

স্বভাবতই ডাক লক্ষ্য করে এগোবে তখন। ক্রমশ পিছিয়ে যাবে ডাক। এই ভাবে গইন
জঙ্গলে ওরা প্রবেশ করবে। অর্থাৎ যে কোনোভাবে হোক নৌকোর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে
নিতে হবে ওদের। স্টাই আমাদের কাজ। তারপর যা করার আমরা করব।

হল তাই। নৌকায় উঠতে যাবে ওরা, শোনা গেল ডাক। অস্পষ্ট জড়ানো সেই ধৰণি।
ওরা থমকে দাঁড়াল। সাড়া দিল। বিমৃচ্য ভাব। তখন ফের ডাক। তখন তৎপর হল। শুনল
কান ঝাড়া করে। আসছে পশ্চিম প্রান্ত থেকে। নালাটা সে দিকেই। কিন্তু যাবার যে উপায়
নেই। তখন নৌকোর মুখ ঘোরাল। উঠল নৌকোয়। ছপাণ ছপাণ দাঁড় ঠেলে নৌকো এগিয়ে
চলল নালার দিকে।

চুকল নালায়। দেখতে পাইছি সব। নৌকো ভেড়াল খাঁড়িতে। আমরা চূপ। মোট আটজন
নামল। রইল দুজন। নৌকো বাঁধল শক্ত করে একটা গাছের ঝঁড়িতে। তারপর আটজন
জঙ্গলের দিকে এগুলো।

ফ্রাইডে আর কাপ্তেনের সহকারীকে রেখে আমরা দলবল চুপিচুপি ঘূরপথে ডিঙিয়ে
এধারে এলাম। ততক্ষণে নৌকোর দুজনের একজন নেমে পড়েছে ডাঙায়, স্টান চিংপাণ
হয়ে শুয়ে শুমোবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ আধো শুম আধো জাগরণ অবস্থা। অতর্কিংতে
একলাফে পড়লাম গিয়ে তার সামনে। পায়ের আওয়াজে চমকে উঠল। তখন কাপ্তেন
মারল বন্দুকের কুণ্ডো দিয়ে এক ঘা। মৃহুর্তে সে চোখ কপালে তুলে অঞ্জান। তখন নৌকোর
বাকি আরোহীর দিকে বন্দুক উচিয়ে ধরল। বলল, নেমে আয় নয়ত এক গুলিতে তোর
জান নিয়ে নেব।

নেমে আসবে না সে সাহস কি আর তার আছে। চোখের সামনে দেখল সাথীর ঐ
অবস্থা। আর কি মনে এতটুকু জ্বর পায়! সুড়সুড় করে নেমে এল নৌকা থেকে। অশ্ব
কাপ্তেনের হাতে তুলে দিল। হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে। কসম খেল। মোটের উপর
বদমাশ লোক নয়। কাপ্তেনও বলল সে কথা। তখন তাকে আমাদের দলে নিলাম।

ফ্রাইডে আর কাপ্তেনের সহচরও কিন্তু বসে নেই। নিপুণ তাদের কাজ। ডাকতে
ডাকতে গোটা দলটাকে নাকে দড়ি দিয়ে বলতে গেলে ঘূরিয়ে বেড়াচ্ছে। এ পাহাড় থেকে ও
পাহাড়, এ বন থেকে ও বন—সে একেবারে নাজেহাল অবস্থা। শেষে রীতিমতো ফ্রান্ত
তারা। হাঁটিতে আর পারে না। এদিকে আমরাও নিশ্চিন্ত—যতদূরে গিয়েছে সেখান থেকে
নৌকোর কাছে পথ চিনে রাত ঘোর হওয়ার আগে ফিরে আসা অসম্ভব। যদি চেষ্টা করে
তবু? দেখা যাক।

কিন্তু তা বলে এখনি কিছু করতে যাইছি না আমরা। অন্ধকার ঘনাক। রাত হোক। তখন
শুরু হবে আসল খেলা।

ফ্রাইডের ডাক সমানে চলছে। সেরকমই কথা। ডাকতে ডাকতে এদিক ফের নিয়ে
আসবে ওদেরকে। আসছে। শরীর রীতিমতো দুর্বল। পা আর চল না। তা নিয়ে কত
অভিযোগ। তবু নিরূপায়। ঘূরতে ঘূরতে আবার সেই নৌকা। সব দেখে তো তাজব।
ভাটার টানে জল ততক্ষণে সরে গেছে। কাদা মাটির উপর গেঁথে গেছে নাও। আর কোথায়

সেই দুজন প্রহরী? খুঁজল কত। পেলে তো দেখা! আহত মানুষটাকেও আমরা যে ইতোমধ্যে তুলে নিয়ে গেছি। তখন দেখি যারপর নাই ঘাবড়ে গেছে। কান্নকাটি শুরু করার দাখিল। একজন বলল, দানো আছে দীপে। এসব তারই ছলাকল। তখন আস। একজন বলল, দানো নয়, নির্ধারণ বর্বরদের এলাকা। আমাদের নাকে দাঁড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে কাহিল করে শেষে মেরে ফেলবে। তারপর কেটে কুটে মাংস খাবে। শুনে রীতিমতো হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

ডাকল সঙ্গীদের নাম ধরে অনেকবার। পেলে তো সাড়া! কী করবে তখন বুঝতে পারছে না। এই একবার গিয়ে বসে নৌকোয়, পরক্ষণেই নেমে আবার ডাঙায় এসে ঘুরাঘুরি করে। ঘোটমাট ভীষণ হতাশ তখন। আর দুর্বল। আর সব ঘিলিয়ে ভীষণ এক আস।

আমরা এই অবস্থার সুযোগ অন্যায়ে নিতে পারি। রাত হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাপিয়ে পড়তে পারি রে রে করে। ওদের যা অবস্থা এতটুকু বাধা দেবার সুযোগ পাবে না। এতটুকুও নটিয়ট করলে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাবে। চাই কি আমাদেরও দু একজন মরতে পারে। সেটা আমার অভিপ্রায় নয়। বন্দী করতে চাই সবাইকে, তবে এতটুকু রক্তপাত না ঘটিয়ে। তখন সবাইকে বললাম, তোমরা পা টিপে টিপে যতদূর পার ওদের কাছাকাছি এগিয়ে যাও। গুলির নাগালের মধ্যে। তারপর যা করণীয় আমি বলব।

গেল তাই। ভেবেছিলাম বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ঘটনার জন্যে। তার আর দরকার হল না। দলের নেতা সেই শয়তানটা এদিকেই আসছে। সঙ্গে দুই সাকরেদ। কথা শুনতে পাচ্ছি স্পষ্ট। তা আমরা তো তাকে চিনি না, কাণ্ডেনই গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল। অঙ্ককারে আবছা তার অবয়ব। শেষে একদম হাতের নাগালের মধ্যে। তখন কি আর পারে কাণ্ডেন এই সুযোগের সম্ভবহার না করে? মনে যে ভীষণ জ্বালা। অমনি দুই সঙ্গীকে নিয়ে লাফিয়ে পড়ল তাদের ঘাড়ে। হাতের বন্দুক ভীরু শব্দে গর্জে উঠল।

অঙ্গুত নিশানা। মরল সেই শয়তান তৎক্ষণাৎ। একজন সাকরেদ ভীষণ ভাবে জখম। মরল যদিও আরো ঘন্টাখানেক পরে। বাকি আর একজনের গায়ে আঘাত তেমন লাগে নি। ঘটনার আকশ্মিকতায় সে হতভঙ্গ মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে দৌড়ল পরিত্রাহি বেগে।

তখন আর আড়ালে বসে থাকা যায় না। ঘটনা যতদূর গড়িয়েছে তাকে সামল দেবার প্রয়োজন আছে। দলবল সম্মেত অমনি এগিয়ে গেলাম। বিরাট বাহিনী এখন তো আমার। আটজনের দল। আমি সেই দলের সেনাপতি। ফাইডে আমার দক্ষিণ হস্ত। আর কাণ্ডেন বাঁ-হাত। সকলেরই হাতে অস্ত্র। অঙ্ককার ভেদ করে সোজা গিয়ে তাদের ঘুঁথোঘুঁথি হলাম।

সে ভারি মজা। অঙ্ককারে দেখতে পায় না তো আমাদের পরিষ্কার, আমরা কতজন, কী কী আস্ত্র আমাদের হাতে মজুত কিছুই আন্দজ করতে পারে না। দেখি চারধারে ঘন ঘন চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। তখন নৌকো থেকে ধরে যাকে দলে নিয়েছি খানিকক্ষণ আগে, তাকে বললাম, তুমি ওদের সঙ্গে কথা বল। ওরা যদি স্বেচ্ছায় ধরা দেয় আমরা কোনো ক্ষতি ওদের করব না। কিন্তু যদি উলটোপালটা কিছু করার চেষ্টা করে, তবে মুশকিলে পড়বে।

সে তখন নাম ধরে ডাকল একজনকে, টম, টম, স্মিথ?

টম বলল, কে, রবিনসন নাকি?

বলল, হ্যা, আমি রবিনসন। আমি নিরাপদেই আছি। যদি বাঁচতে চাও এক্কুনি হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও। আত্মসমর্পণ কর।

—কার কাছে আত্মসমর্পণ করব?

—আমাদের কাছে। মন্ত দল আমাদের। পঞ্চাশ জন যোদ্ধা। কাপ্টেনও আছে দলে। তোমাদের পাণ্ডা একটু আগে মারা গেছে। আরেকজন ভীষণভাবে জখম। যদি বাঁচতে চাও এইবেলো হাত থেকে অস্ত্র ফেলে দাও।

—একটু ভাবনার সময় চাইছি। ধর পনের মিনিট। তারপর তোমাকে জানাব।

—সময় দেওয়া যেতে পারে তবে এক শর্তে—যদি তোমরা সকলে আত্মসমর্পণ কর। অবিশ্য সময় দেবার মালিক এই মুহূর্তে কাপ্টেন। তাকে জিজ্ঞেস করে দেখি।

বলে জোরে জোরেই রবিনসন কাপ্টেনের কাছে সব বলল।

কাপ্টেন বলল, স্মিথ, আমি কাপ্টেন বলছি। আমার গলার আওয়াজ শুনে নিশ্চয়ই তুমি বুঝতে পারছ। যদি এই মুহূর্তে অস্ত্র ত্যাগ করে তোমরা ধরা না দাও, তবে তোমাদের জীবন সংশয়। বিশেষ করে উইল অ্যাটকিসের।



অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়লো.....

উইল দলের পাণ্ডা ডান হাত। পালিয়ে এসেছে জখম অবস্থায়। কাপ্টেনের কথা শেষ হতে না হতে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল, দোহাই কাপ্টেন, পনেরটা মিনিট সময় আমাদের দিন। আমরা কথা দিছি অস্ত্র ত্যাগ করব। আমাকে দোষ দেবেন না। আমি অনেক অপরাধ করেছি। তার জন্যে দোষ স্বীকার করে নিছি।

পরে শুনলাম অ্যাটকিস নাকি জাহাজে কাপ্টেনের গলা চেপে ধরেছিল। গালাগাল দিয়েছে অকথ্য ভাষায়। ছাড়ে আর কি কাপ্টেন! তার সেই এক গৌ—অস্ত্র আগে ত্যাগ কর। তারপর মালিকের সাথে কথা বলে দেখব তোমার জীবন রক্ষা করা যায় কিনা।

মালিক অর্থাৎ এক্সেক্ট্রে আমি। কথা আছে আমার নির্দেশ ছাড়া এ দীপে কোনো কিছু এরা করবে না। কাপ্টেন সেই নির্দেশ হ্রবহ মান্য করেছে।

তখন একে একে অস্ত্র নামিয়ে রাখল ছজন। দুজন তো মৃত, দুজন আমাদের দখলে।

বন্দী করা হল প্রত্যেককে। শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা হল হাত পা। নিয়ে গেল তাদের গুহার দিকে। আমি আর দলের আর একজন ইচ্ছে করেই প্রকাশ্যে দেখা দিলাম না। তারও কারণ আছে। সেটা কী, পরে বলব।

কাজ এখন অনেক। ছাঁদা-করা নৌকোটা সারাতে হবে। সেদিকে গেলাম আমরা কজন। কাপ্টেন গেল বন্দীদের সাথে। অনেক রাগ তো মানুষটার যনে। অনেক ঝালা। বকাবকি করুক একটু ওদের। তাতে ঝালা মিটবে।

পরে শুনেছিলাম, বন্দীদের কেউ নাকি অভিযোগের উত্তরে রা টুকু কাটে নি। মাথা নিচু করে শুনেছে নিজেদের অপরাধের কথা। নতজনু হয়ে প্রার্থনা করেছে নিজেদের জীবন। প্রাণ ভিক্ষা যাকে বলে। কাপ্টেন বলেছে, তোদের নিয়ে যা দেশে, বিশ্বাহের অভিযোগে এক একটাকে ফাঁসিতে ঢ়াব। তারা দৃঢ় প্রকাশ করেছে। বলেছে কাপ্টেনকে দ্বীপে নির্বাসন দেবার আগে ভেবেছিল এটা নির্জন নিরিবিলি দ্বীপ, কিন্তু নির্জন যে নয়, তাতে তারা বরং সম্ভুট। ঈশ্বর হাতে করে রক্ষা করেছেন কাপ্টেনকে। তার জন্যে তারা ঈশ্বরের প্রতি চির কৃতার্থ।

শুনে কাপ্টেন বলেছে আপাতত কারুর প্রতি সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। অপরাধের বিচার যা কিছু হবে ইংল্যান্ডে ফিরে গিয়ে। তবে উইল অ্যাটকিস্স ক্ষমার অযোগ্য। সে যেন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়। তোর হলেই তার ফাঁসি হবে। এটা মালিকের নির্দেশ।

বলাবাহুল্য আমি এরকম কোনো নির্দেশ দিই নি। শোনামাত্র হুমড়ি খেয়ে পড়ল অ্যাটকিস্স কাপ্টেনের পায়ের উপর। আর সে কী কান্না!—দোহাই আপনার, মালিককে বলুন, আমি আর এমন অপরাধ কখনো করব না। আমাকে যেন প্রাণে না মেরে ফেলেন।

শুনে বাকিরা বলল, মালিককে আমাদের হয়েও একটু বলুন। দেশে ফিরে যেতে আমরা চাই না। ফিরে যাওয়া মানেই ফাঁসি কাঠে মৃত্যু। বরং আমরা এখানেই থাকব। দোহাই আপনার। আমাদের যেন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে না যাওয়া হয়।

মোটামুটি পরিকল্পনা মতোই কাজ এগোছে। সেটা আমাদের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু এমতাবস্থায় জাহাজ দখলের ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে। এবং আমার অস্তিত্ব ঘোষণারও প্রয়োজন আছে। তখন পাঠিয়ে দিলাম একজনকে। বললাম, যাও গিয়ে বল, কাপ্টেন যেন আমার সাথে একবার দেখা করে।

সে সবাইকে শুনিয়ে বলল, কাপ্টেন, আপনাকে মালিক তলব করেছেন।

অমনি তড়িঘড়ি উঠে পড়ল কাপ্টেন। বলল, যাও তুমি গিয়ে মালিককে বল, যেন অপরাধ না নেন—আমি এক্সুনি যাচ্ছি।

মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে তখন বন্দীরা। এটা ফ্রাইডের কাছ থেকে পরে আমি শুনেছিলাম। হয়ত মালিকের তরফ থেকে ফের কী নির্দেশ আসে, তারই জন্যে এই হতবিহুল ভাব। তা এল কাপ্টেন। আমি জাহাজ দখলের ব্যাপারে আমার পরিকল্পনার কথা সবিস্তারে ব্যক্ত করলাম। শুনে ভারি খুশি। ঠিক হল পরদিন ভোরেই আমরা কাজে লেগে পড়ব।

ভোরে উঠে প্রথম কাজ হল বন্দীদের দু ভাগে ভাগ করা। অ্যাটকিস্স সম্মত বাকি দুই দুশ্মনকে নিয়ে যাওয়া হল গৃহায়। হাত পা বেঁধে বাকিদের দলে ফেলে রাখা হল। এটা করল ফ্রাইডে আর প্রথম নৌকোয় আসা সেই দুই সাকরেদ। বাকিদের পাঠালাম আমার

মাচানে। হাত পা তাদেরও শক্ত করে বাঁধা। নিরাপদ আশ্রয়। যদি নেওয়া হল সরিয়ে। তদুপরি চারদিক ডাল পাতার ঘেরা। বাইরের কেউ যে দেখতে পাবে এমন সম্ভাবনা নেই।

খানিক পরে পাঠালাম মাচানে কাণ্ঠেনকে।—যাও, তুমি গিয়ে এবার ওদের সঙ্গে কথা বল।

কথা অর্থাৎ দলে টানবার চেষ্টা। যদি এদের পাঠানো যায় জাহাজে। আচমকা গিয়ে অবাক করে দেবে বাকি নাবিকদের। তাদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে। বন্দী হবে তারা। তারপর আমরা গিয়ে নিরাপদে জাহাজের দায়িত্ব নেব।

বলতে তো আর কোনো অসুবিধা নেই। মালিকের নাম উল্লেখ করে একেকটা কথা ছেড়ে দিলেই হল। ভয় দেখাল খুব। বলল, দেশে ফিরে যাবার অর্থই হল ফাঁসি। আর এই দ্বিপে থাকা মানে চিরতরে নির্বাসন। যদি এমতাবস্থায় তারা আমাদের মত মতো কাজ করার অঙ্গীকার করে। যদি জাহাজে গিয়ে অতর্কিংতে ঘায়েল করতে পারে বিজ্ঞাহী নাবিকদের, তবে মালিককে বলে সে কমিয়ে দেবে তাদের শাস্তির মাত্রা। যেন তারা ভেবে দেখে।

এরকম প্রস্তাবে যে তৎক্ষণাত্ম সম্মতি মিলবে এত জানা কথা। যে কোনো শিশুও বলে দিতে পারে। অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাণ্ঠেনের পায়ের উপর। আর প্রতিজ্ঞা। আর দুর্বরের নামে শপথ। তখন কাণ্ঠেন বলল, বেশ, তবে আমি মালিককে গিয়ে জানিয়ে আসি আমাদের মনোভাব। বলি তাকে সব খুলে। দেখি তিনি কী বলেন।

বলে এল আমার কাছে। মন দিয়ে শুনলাম সব ঘটনা। বললাম, কী মনে হয় তোমার? বলল, আমার মনে হয় আর কোনো রকম গোল পাকাবার চেষ্টা করবে না। বললাম, বেশ, তাহলে ঐ পাঁচজনকে সঙ্গী হিসেবে নাও। বাকিরা বন্দী অবস্থায় থাকুক। যাদের সঙ্গে নেবে তাদের এটুকু শুধু জানিয়ে দাও, যদি ঠিক ঠিক হিসেব মতো কাজ না করে, তবে তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে বাকি বন্দীদের ফাঁসি দেওয়া হবে।

কঠোর সিদ্ধান্ত। কিন্তু এছাড়া আমার কোনো উপায় নেই। এরকম একটা লুমকি না দিলে হিসেবে বালচাল করার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সেই ভাবেই কাণ্ঠেন গিয়ে বোঝাল। বলল, মালিকের এটাই সংকল্প। এর অন্যথা হবার উপায় নেই। যেহেতু এই দ্বিপের তিনিই প্রতি। সুতরাং এমতাবস্থায় তোমরা যা ভালো বোঝ করবে।

শক্তিতে এখন আমরা খুব একটা কম নই। লোকবল একুনে চৌদ্দ। কাণ্ঠেন, তার সহকারী আর সেই নির্দোষ যাত্রী। তারপর প্রথম দলের সেই দুই বন্দী। তারা এখন পুরোপুরি আমাদেরই অনুগত। তাদের হাতে বন্দুক দিতে আমার এখন আর কোনো দ্বিধা নেই। এরপর সেই দুই বন্দী—এয়াও প্রথম দলের। মাচানে হাত পা বেঁধে ফেলে রেখেছিলাম কাল অঙ্গি। কাণ্ঠেনের কথায় এখন মুক্ত। এছাড়া বর্তমানের সর্বশেষ মুক্ত সেই পাঁচ বন্দী। মেট বার। সঙ্গে ফ্রাইডে আর আমি তো আছিই। বন্দী হিসেবে গুহার আড়ালে রইল এখনো পাঁচজন। এদেরকে মুক্ত করার বাসনা আপাতত নেই। যাবার দাবার যথারীতি হাতের কাছে পেঁচ দিই। কোনোক্রমে বাঁধা হাতে থায়। এদের আমরা অতিথি বলেই ধরে নিয়েছি।

কাণ্ঠেনকে বললাম, আমি আর ফ্রাইডেকে বাদে বাকি বারজনের দল নিয়ে জাহাজ দখল অভিযানে যেতে রাজি কি না। বলল কোনো ভয় নেই, নিশ্চয়ই যাব। আপনার অনুমতির শুধু অপেক্ষা! তা আমার আর অনুমতি দিতে অসুবিধা কি। বললাম একটু ধৈর্য ধরুন। আরেকটু কাজ বাকি আছে। সেটা করে নিই।

ফ্রাইডেকে বললাম, এক কাজ কর। দুই বন্দীকে আমার গুহা থেকে বের করে দূরের ঐ গুহাটায় নিয়ে যা। সেখানে আমি ওদের সাথে কথা বলব।

নিয়ে গেল তাই। তখন আমি আর কাপ্টেন গেলাম তাদের সঙ্গে দেখা করতে। কাপ্টেন আমাকে দেখিয়ে বলল, একেই মালিক হ্রস্ব দিয়েছেন তোমাদের দেখা শোনা করার জন্যে। একে অমান্য করো না। বিপদে পড়বে। তাহলে ধরে ধরে নিয়ে যাবে দুর্গে। সেখানে অরুকুপ আছে। আর এক বাঁক সৈন্য। লোহার ভারী ওজন চাপা দিয়ে রাখবে তোমাদের। আরো নানারকম শান্তি দেবে। সে সাংঘাতিক। আমি ভাবতে পারছি না।

তখন সেই বেশ টেনে আমি ফেঁদে বসলাম নানান আজগুবি গল্প। তাতে চোখ তাদের ছানাবড়া। বলল, এতটুকু গোলমাল কেউ করবে না। শান্তি বজায় রাখবে। আমি যেন মালিককে বলি, যে প্রাণে তাদের না মারেন।

মোটমাট সবই শুভ। কাপ্টেনের রওনা হতে আর কোনো অসুবিধে নেই। বন্দী সংখ্যা পাঁচ। তার থেকে তিনজনকে আমরা আলাদা করতে পারলাম। এতে সম্বিতে শক্তি হ্রাস পাবে। দুজন রহিল এধারে। বাকি তিনজন আরেক গুহায়। চেষ্টা করে কেউ পারবে না কারো হৃদিস বের করতে। তো ভাবনা কী!

রওনা হল কাপ্টেন। দুটো নৌকোয় দু দল। একদলে সেই যাত্রী, চার বন্দী আর সে নিজে, আরেক দলে সহকারী আর পাঁচ বন্দী। বেরল যখন বেশ রাত। জাহাঙ্গৈর কাছাকাছি পৌছতে পৌছতে প্রায় বারটা। রবিনসন ডাকল একজন নাবিকের নাম ধরে। বলল লোকজন নিয়ে নৌকো নিয়ে তারা ফিরে এসেছে। শুরু হল এই নিয়ে খোশ গল্প। ইত্যবসরে কাপ্টেন আর তার সহকারী পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠল গিয়ে জাহাঙ্গৈ। অতর্কিংত বিদ্রোহী নাবিকদের দুই পাণাকে ঘায়েল করল। উঠে পড়ল হৈ হৈ করে বাকিরা। তখন আর পায় কে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো জাহাজ নিজেদের অধীনে। বিদ্রোহী সকলেই বন্দী। হাত পা বেঁধে ঘরে আটক করা হল সবাইকে।

তখনো গভীর ঘুমে নিমগ্ন বিদ্রোহের প্রধান পাণ্ড। সেও কাপ্টেনের আরেক সহকারী। তাকে হাঁকড়াক করে তোলা হল। উঠে দেখে সামনে কাপ্টেন। হাতে উদ্যত পিস্তল। তখন তো ভূত দেখার সম্ভিল। ধাতস্ত হতে লাগল সামান্য কয়েক মুহূর্ত। তারপর প্রচণ্ড হক্কার ছেড়ে কাপ্টেনের দিকে দিল একলাফ। অমনি গুলি। মুখের ভিতর দিয়ে চুকে বেরিয়ে গেল কানের ওপরে খুলি ফুটো করে। আর সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ল খেবেয় মন্ত্র শরীর। যেন কাটা গাছ। ব্যস, ব্যথ সব। বিদ্রোহ পুরোপুরি দমন। অমনি তোপ ঘরে গিয়ে পরপর সাতবার কামান দাগল কাপ্টেন। এটা আমারই নির্দেশ। জাহাজ যে দখল হয়েছে সেটা জানান দেবার ইচ্ছা। আমার তো আর আনন্দ ধরে না। জেগে আছি সারারাত কখন শুনব এই আওয়াজ সেজন্যে। দেবি তখনো প্রায় এক প্রহর রাত বাকি। আর ঘুম পাচ্ছে ভীষণ। সারা শরীরে অদম্য এক ক্লুস্তি। শুয়ে পড়লাম মাটির উপরই। অমনি ঘুমে সারা শরীরে তলিয়ে গেল।

ঘুম ভাঙল হঠাৎ। বন্দুক গর্জে উঠল যেন কোথায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। কে যেন ডাকছে আমাকে দুহাতে। হাসছে। কিন্তু চোখে জলের ধারা। বলল, ঐ দেখুন জাহাজ, আপনার জাহাজ। আপনি রক্ষাকর্তা। আপনি আমাকে না বাঁচালে আজ এই জাহাজ উদ্ধার করতে পারতাম না। আমিও সে অর্থে আপনার সেবাদাস। আদেশ করুন এবার কী করতে হবে।

তাকিয়ে দেখি মাত্র আধ মাইল দূরে জাহাজ নিয়ে এসেছে কাপ্টেন। নোঙ্গর ফেলেছে।

আবহাওয়া শান্ত। ভয়ের কোনো কারণ নেই। নোকো বেয়ে চলে এসেছে কাপ্টেন আমাকে খবর দিতে। নোকো নালায় বাঁধা। আমাকে সেটাও আঙুল দিয়ে দেখাল।

অর্থাৎ মুক্তি আমার আসন্ন! এটা এবার স্পষ্ট বুঝতে পারছি। এই বন্দী দশা, নির্জন দ্বীপবাসের এই আঠাশ বছর প্রায়—এর থেকে মুক্তি। আমি কি জাগরণে না নিদায়! গায়ে চিমটি কাটলাম জোরে। ব্যথা লাগল। তবে তো জেগেই আছি। সত্যিই তাহলে মুক্তি এবার পাব। সারা শরীরে রক্ত যেন মুহূর্তে ছলাখ করে উঠল। মাথাটা বৌঁ বৌঁ করে ঘূরছে। আকঁড়ে ধরলাম কাপ্টেনের হাত সজোরে। কে জানে, আমি হয়ত চৰম উভেজনায় মাটিতে পড়ে যাব।

আমার যে এই অবস্থা সেটা কাপ্টেনের নজরে গেছে। অমনি পকেট থেকে চ্যাপ্টা বোতল বের করে ছিপি খুলে ঢেলে দিল আমার মুখে। ব্যান্ডি। শরীরে যেন বল পেলাম। পরে বলেছিল, আমার কথা ভেবেই নাকি বোতল পকেটে করে আনা।

আর সে যে কত শুক্রা, কত প্রশংসা, কত প্রাণখোলা ভালবাসার কথা! যেন ঘোরে রয়েছে মানুষটা। আশ্চর্য সেই ঘোর। কথায় পেয়ে বসেছে। বুকের মধ্যে জমাট শেষ কথার বিন্দুটি অঙ্গি বের না করে দিয়ে শান্তি নেই।

আমারও কথা জমে আছে বুকের মধ্যে অনেক। জড়িয়ে ধরলাম ফের। বললাম, তুমি আমার পরিত্রাতা। তোমার সহযোগীতা না পেলে আমিও কি পারতাম এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পেতে? ঈশ্বরের প্রেরিত দৃত তুমি। তোমাকে তিনিই আমার সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন। তোমার এই ভালোবাসা, এই সহযোগিতার কথা আমি জীবনে ভুলব না।

বলে হাঁটু গেড়ে বসলাম মাটিতে। দেখাদেখি সেও। দুহাত শূন্যে তুলে প্রার্থনা করলাম ঈশ্বরকে। —প্রভু, তুমি সুখে দুঃখে মানুষের সঙ্গী। মানুষকে তুমিই ফেল দুঃখ সাগরে আবার তুমিই তার ত্রাণ কর। তোমাকে প্রণাম। শতকোটি প্রণাম।

কাপ্টেন বলল, এই আনন্দের দিনে জাহাজ থেকে আমার জন্যে সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছে। যদি আমি সম্মতি দিই আমাকে দিতে পারে। বললাম, বেশ তো, দাও না। তখন নোকার লোকটাকে ডেকে কী যেন বলল। নিয়ে এল সে মস্ত এক কাঠের পেটি। খুলে ফেলল ঢাকনা। দেখি নানান জিনিসে বোঝাই। সুস্বাদু পানীয় থেকে শুরু করে তামাক, টিনে ভরা গরুর মাংস, বিস্তুর বিস্কুট, কিছুটা শুয়োরের মাংস আর সেক্ষ মটর, সঙ্গে এক প্যাকেট চিনি, এক বোঝাই লেবু, দু বোতল লেবুর রস, আরো কত যে টুকিটাকি আমার সব মনে নেই। সব থেকে ভালো লাগল ছ প্রস্তুত পোশাক দেখে। সব নতুন। তাতে শার্ট থেকে শুরু করে পাঞ্জুন, গলাবজ্জ মায় রুমাল অঙ্গি আছে। জুতোও এনেছে এক জোড়া, সঙ্গে মোজা। আর একখানা জাঁদরেল টুপি। মোটমাটি সাজাবে দ্বীপের মালিককে। সাজ্জা যাতে মালিকের মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তো!

পরলাম এক প্রস্তুত পোশাক। বলব কী, এতদিন পর এমন অস্পষ্টি লাগছে। বেশ খানিকক্ষণ লাগল নিজেকে পোশাকের সাথে মানিয়ে নিতে। তারপর মোটামুটি খানিকটা ধাতবু হলাম।

পেটি পৌছে দিয়ে গেল আমার শুহায়। দেবে,—আমি যে মালিক। বসলাম দুজনে মুখোমুখি। বন্দীদের নিয়ে কী করব সেটা ঠিক করার প্রয়োজন আছে। রাস্তা আমাদের সামনে দুটো। এক, নিয়ে যেতে পারি তাদের সঙ্গে করে আমাদের সাথে, কিংবা এখানে নির্বাসন দিতে পারি। তবে সবাইকে নয়। আমাদের মূল নজর সেই দুই দুশ্মনের দিকে। এদের নিয়ে কী করব সেটাই সমস্যা। কাপ্টেন দেখি যা বলি তাতেই ইতস্তত করে। অর্থাৎ

ঠিক কী করবে সেটা স্থির করতে পারছে না। তখন বললাম, বেশ তো, যদি ইচ্ছে হয় তোমার, আমি নয় দুজনকে এখানে আনাবার ব্যবস্থা করি। তুমি কথা বল। এমনভাবে বল যাতে ওরা নিজেরাই এখানে নির্বাসিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

কাণ্ডেন রাজি। বলল, তাই ভালো। আপনি এখানে ওদের আনান। আমি কথা বলব। তবে হাঁ, আপনাকেও থাকতে হবে।

তখন পাঁচবন্দীকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মাচানে নিয়ে যাবার জন্যে ফ্রাইডে আর দুই সঙ্গীকে হকুম দিলাম। বললাম, আমি না পৌছানো অঙ্গি তাদের যেন কড়া পাহারায় রাখা হয়। কেউ যেন পালাতে না পারে। সাবধান।

হল তাই। ইচ্ছে করেই বেশ খানিকটা দেরি করে আমি দিয়ে হাজির হলাম। পরনে আমার নতুন পোশাক। পৌছবার সাথে সাথে ‘মালিক’ ‘মালিক’ বলে কাণ্ডেন আর ফ্রাইডের যা ডাকাডাকি আর শুন্দা প্রদর্শনের ঘটা! বললাম, নিয়ে আয় এবার ওদের আমার সামনে। তখন নিয়ে এল। সব বললাম আমি। তাদের দুর্ব্যবহার—সব। শেষে বললাম, বল এবার, এর শাস্তি হিসেবে কী তোরা প্রত্যাশা করিস্।

বলে না কিছুই। দেখি চুপচাপ। তখন বললাম, জাহাজ আর তোদের দখলে নেই। আমরা দখল করেছি কাল রাত্রে। যাত্রার জন্যে প্রস্তুত। তোরা পাপী। পাপীরা পৃথিবীতে নিজেরাই নিজেদের কৃতকর্মের দ্বারা নিজ নিজ কবর খনন করে। তোরা এখন সেই কবরের সামনে দাঁড়িয়ে। ফাঁসি হবে তোদের। এক একটাকে গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেব, তারপর আমরা এখান থেকে রওনা দেব।

একজন বলল, কাণ্ডেন বন্দী করার সময় নাকি প্রতিশ্রূতি দিয়েছিল তাদের জানে মারবে না। তবে এখন কেন এই ফাঁসির আদেশ? বললাম, ফাঁসি ছাড়া তোদের আর কিছুই প্রাপ্য নেই। এখান থেকে যদি তোদের বন্দী অবস্থায় দেশে নিয়ে যাই, তবে সেখানেও তোদের ফাঁসি হবে। বল এখন, কোথায় ফাঁসি যেতে তোদের ইচ্ছে।

তখন অনুনয় বিনয় করল। দয়া প্রার্থনা করল। জীবন রক্ষার জন্যে আবেদন জানাল। বললাম, বেশ তবে শেষ কথা আমার কোন। জীবন রক্ষা পেতে পারে, কিন্তু দেশে নয়, এখানে। আমিও লোকজন নিয়ে জাহাজে করে ফিরে যাব বলে ঠিক করেছি। এখানে তোদের রেখে যাব। এছাড়া তৃতীয় বিকল্প আর কিছু নেই। বল সেটা তোদের মনঃপৃত কিনা।

সবাই একবাক্যে আমাকে সাধুবাদ জানিয়ে আমার প্রস্তাবে সায় দিল। কাণ্ডেন বলল, নানা, এটা ঠিক নয়। আমার এতে মত নেই। এ আপনি কী করলেন?

গুনে ভীষণ যেন রেগে যাচ্ছি আমি, সেইরকম ভঙ্গি করে বললাম, তোমার মত আছে কি না, সেটা আমার দেখার প্রয়োজন নেই। এরা আমার বন্দী। এদের নিয়ে যা ইচ্ছে আমিই করব। আমি এদের মুক্তি দেব। যদি সেটা তোমার মনঃপৃত না হয়, তবে মুক্তি দেবার পরে তুমি এদের ফের বন্দী করতে পার। তখন যা খুশি করবে, আমি বাধা দেব না।

কাজে লাগল আমার ছদ্ম রাগ। দেখি তাতে আরো সন্তুষ্ট। অজস্র সাধুবাদ জানাল আমাকে। বললাম, এদের বাঁধন খুলে দাও। তখন বাঁধন খুলে দেওয়া হল। বললাম তোমরা এবার মুক্ত। বনে বনে স্বাধীন ভাবে বিচরণের অধিকারী। আমি তোমাদের বন্দুক দেব সকলকে, আর গোলাবারুদ। অন্যান্য নানান ব্যবস্থা আছে আমার। যেমন ক্ষেত, যেমন পশুপালন। এগুলো তোমাদের দেখিয়ে দেব। তোমাদের জীবনধারণে এতটুকু

অসুবিধে হবে না।

কাপ্তেনকে বললাম, তুমি জাহাজে চলে যাও। আমি আজকের রাতটুকু এখানেই থাকব। শেষ মুহূর্তের কিছু কিছু কাজ এখনো বাকি। কাল ভোরে তুমি নৌকোটা আমার জন্যে পাঠিয়ে দিও। আর হ্যাঁ, জাহাজের নতুন কাপ্তেন সেই শয়তানটাকে সবার ঢোকের সামনে ফাসি দিও। যেন ভুল না হয়। আমি যেন গিয়ে তাকে জীবিত না দেখি।

বলা বাহ্য্য, এটা সকলকে শুনিয়ে বলা। সে শয়তান কাপ্তেনের হাতে কাল রাতেই মরেছে। মরা মানুষকে নতুন করে ফাসি দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

কিন্তু এদের শোনাবার প্রয়োজন আছে। এরা ভয়ে আতঙ্কে নতুন কিছু অঘটন ঘটাবার সাহস পাবে না।

কাপ্তেন চলে গেল জাহাজে। আমি বন্দীদের নিয়ে আমার ডেরায় গেলাম। আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে। সব বললাম, বোঝালাম সব কিছু। মৃত্যু আর নির্বাসন—দুটোর মধ্যে যে তারা নির্বাসন মেনে নিয়েছে এতে আমি খুশি। সেটা জানালাম। তারপর শোনালাম



চাবুক মারা হলো

আমার দীপে আগমন থেকে এ পর্যন্ত এই ছাবিশ বছরের ইতিবৃত্ত। ঘটনা সবই, কিন্তু এখন নিজের কানে লাগছে যেন গল্পের মতো। তারাও গল্প শোনার মতো করেই শুনল। অর্থাৎ ভয়ড়ির নয়, ব্যাপারটার মধ্যে যে আগাগোড়া রোমাঞ্চের ছোঁয়া আছে, সেটা মোটের উপর হাবেভাবে বুঝলাম তাদের বেশ চঢ়কৃত করেছে। তারপর নিয়ে গেলাম আমার ক্ষেত্র দেখাতে। কীভাবে চাষ করি, কী তার যন্ত্রপাতি, আঙুর কোথায় কোথায় পাওয়া যায়।

ছাগলের খোয়াড় কোথায়—সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম। ঘোল জন স্পেনীয় নাবিকের কথাও বললাম। যে কোনো মৃত্যুতে তারা এখানে হাজির হতে পারে। যেন তাদের সাথে বিদ্যুম্বাৎ অসদাচরণ না করা হয়। বন্ধুর মতোই যেন গ্রহণ করা হয় সকলকে।

যোট আটো বন্দুক আমার। সব তুলে দিলাম তাদের হাতে। আর তিনখানা তলোয়ার। প্রায় দেড় পিপে বারুদ এখনো মজুত। এখানে আসার বছর দুই পর থেকে তেমনভাবে বারুদ তো আর ব্যবহার করি নি। বলতে গেলে বেশির ভাগটাই রয়ে গেছে। ছাগল কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়, ধরতে হয় কীভাবে এতটুকু বারুদ না খরচ করে—সেটাও

শিখিয়ে দিলাম। আর শেখালাম দুধ দোওয়াবার কৌশল। দুধ থেকে কী কী বানাতাম, কেমন করে বানাতাম, সব শেখালাম।

অর্থাৎ বাদ কোনো কিছুই নেই। দ্বিপে আমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, তার সংগ্রাম, আত্মরক্ষার জন্যে নানান উদ্ধাবনী প্রক্রিয়া—সব কিছুর সাথে ঘটনাকে মিশিয়ে বললাম প্রতিটি খুটিনাটি বিবরণ। বললাম, কাণ্ডেনকে বলে আরো দু পিপে বারুদ যাতে তোমাদের দিয়ে যাওয়া যায় আমি তার ব্যবস্থা করব। আর মটের দানার খলিটা হাতে তুলে দিলাম। বললাম, চাষ করো। ভালো ফলন হবে। এটা তোমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার নতুন সংযোজন।

আর একটা মাত্র কাজ থাকি। সবাই এক ঠাই বসে নৈশ ভোজ। কাণ্ডেনের পাঠানো জিনিস আর সঙ্গে আমার ঘরোয়া সব কিছু মিলে মিশে জমল সে যা দারুণ! খুব হৈ হৈ হল। দ্বিপে এই আমার শেষ রঞ্জনী। কাটল সারারাত গভীর উদ্দেজনার মধ্যে। ছাবিশ বছরের নির্বাসিত জীবনের কালই হবে তাহলে শেষ! ভোর হতে দেখি কাণ্ডেনের প্রেরিত নৌকো হাজির। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আমি গিয়ে নৌকোয় উঠলাম।

রাত্রেই ছাড়ার কথা জাহাজ, ছাড়া হল না। এটাও আমাদের আগে থেকে ঠিক করা ফন্দি। পরদিন ভোর তখন। দেখি পাঁচজনের দুজন এতখানি পথ সাতরে সাতরে এসেছে। ঘুরছে জাহাজের আশে পাশে। আর সে কী কাতর আবেদন!—দোহাই আমাদের নিয়ে চলুন। এখানে রেখে গেলে আমরা বাঁচব না। ওরা আমাদের কালই মেরে ফেলবে। হোক ফাঁসি, তাও সই, তবু দেশে যাব। ওদের হাতে কিছুতে মরব না।

শুনে কাণ্ডেন বলল, বুবলাম তো সব, কিন্তু আমার যে কিছু করার ক্ষমতা নেই। মালিক মত না দিলে আমার যে হাত পা বাঁধা। তখন আমাকে তলব করে আনা হল। শুনলাম মন দিয়ে প্রতিটি কথা। কাণ্ডেনকে বললাম, বেশ, এদের জাহাজে তুলে নাও। কিন্তু অপরাধী এরা। তার শাস্তি এদের প্রাপ্য। চাবুক মারো এদের। একদিন উপোস থাকুক। এতেও যদি পাপের বোঝা লাগব না হয় তবে অন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

হল তাই। চাবুক মারা হল। অনাহারে রাখা হল। টু শঙ্গটি অঙ্গি করল না। তারপর খাবার দিলাম। স্বাভাবিক আচরণ করতে লাগলাম। কোনো দিন আর ভুল করে কখনো মাথা গরম করে নি বা অবাধ্য হয় নি।

দুজনকে জাহাজে তুলে নেবার পর নৌকো নিয়ে কজন গেল কুলে। সঙ্গে এটা ওটা নানান জিনিস। যেগুলো আর কি ওদের পাঠিয়ে দেব বলে প্রতিশৃঙ্খল দিয়ে এসেছিলাম। অধিকস্তু কাণ্ডেন নিজে দয়াপরবশ হয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে এক বাক্স জামা প্যান্ট। এটা উপরি পাওনা। আমাকে জিঞ্জেস করেছিল। আমি আপন্তি ফরি নি। সে যাই হোক, বলে পাঠলাম, যেন শাস্তি ও সুস্থির হয়ে থাকে। আমি দেশে পৌছে এদিকে যে জাহাজ আসবে তাকে বলে দেব তাদের কথা। যেন ফেরার সময় সঙ্গে নিয়ে যায়। এটা নিছক প্রতিশৃঙ্খল নয়। যাতে আসে কেউ, সেদিকে আমি নজর রাখব।

হাঁ ভালোকথা, বলতে ভুলে গেছি,—জাহাজে ওঠার আগে কিন্তু আমার সেই বিশ্যাত ছাতা আর টুপি আর ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরী সেই বিকট দর্শন পোশাক সঙ্গে আনতে ভুলি নি। এর সাথে আমার ছাবিশ বছরের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই যে মুদ্রা কটা কিংবা সোনা রূপোর সেই কটা টুকরো—তাও নিয়েছি সাথে। সভ্য জগতে ফিরছি যখন এগুলো এবার প্রয়োজনে লাগবে। তা দেখি জৎ ধরে গেছে কয়েকটা মুদ্রায়। আর বছদিনের অব্যবহারে কেমন এক পুরানো পুরানো ছাপ। তবু মুদ্রা বলে কথা! হাজার পুরানো

হলেও এর কি প্রয়োজন ফুরোয় !

এবার যাত্রা শুরু । তারিখটা দেখলাম । ঘোলশ ছিয়াশি সালের ১৯শে ডিসেম্বর । অর্থাৎ ছাবিশ নয়, আমি এখানে আছি মোট আঠাশ বছর । কে জানে কীভাবে দুটো বছরের হিসেব গোলমাল হয়ে গেছে । সর্বমোট আঠাশ বছর দু মাস উনিশ দিন । তা সব মিলিয়ে এক ইতিহাস বটে । আমার জীবনের অস্তুত রোমাঞ্চকর নিঃসঙ্গ এক অধ্যায় ।

ইংল্যান্ডে পৌছলাম ১৬৮৭ সালের এগারই জুন । সিধে তো আর আসি নি । দুরতে হয়েছে বিস্তর । হিসেব করে দেখলাম, মোট পঁয়ত্রিশ বছর পর আমার ফের ইংল্যান্ডে পদার্পণ । বাড়ি থেকে পালাবার পর সুনীর্ধ কাল কেটে গেছে । আমি এতদিন সেটা বুঝতে পারি নি ।

এবং যা সচরাচর ঘটে থাকে । এতদিন পরে এল একটা মানুষ—সে তো অচেনা অজানা এই দেশে, যেন ভীনদেশী আগস্তুক । সবই প্রায় বদলে গেছে । আগের ছবির সঙ্গে কিছুই আর মেলাতে পারি না । তা সেই যে পুরানো কাপ্টেনের স্ত্রী, টাকা পয়সা মজুত রেখে গিয়েছিলাম যার কাছে,—দেখি এখনো তিনি বেঁচে আছেন । বড় দয়া আমার উপর । মাঝে নাকি আর একবার বিয়ে করেছিলেন । সে স্বামীও মারা গেছে । এখন একেবারে একলা । বড় কষ্টে কাটে দিন । আমাকে বললেন, বাছা আমার যে সে টাকা দেওয়ার সামর্থ্য এখন নেই । বললাম, তার জন্যে কি ! আপনি কিছু মনে করবেন না । আপনার ভালবাসা আমি জীবনে ভুলে না । এই নিন, এই সামান্য কিছু অর্থ রাখুন । বলে সঙ্গের আনা সেই অর্থ—তার বেশির ভাগটাই তাঁর হাতে তুলে দিলাম ।

গেলাম তারপর ইয়ার্কশায়ারে । আমাদের বাড়ি যেখানে । কোথায় সেই বাড়ি । দেখি তার চিহ্নাত্ত নেই । খোজিবর করে জানলাম বাবা মা দুজনেই গত হয়েছেন । বাবা আগে, মা তার পর । সবাই ধরে নিয়েছিল আমি আর বেঁচে নেই । ফলে আমার জন্যে মা কিছু উইল করে রেখে যাবারও প্রয়োজন মনে করেন নি । থাকবার মধ্যে আছে শুধু দুই বোন । তারা কেউ আমাকে দেখে নি । আমি পালাবার পর তাদের জন্ম । সে এক অস্তুত ব্যাপার । অসীম দূরত্ব যেন আমার আর তাদের মধ্যে । সেই ভাবেই দায়সারা গোছের কিছু কথা বলল । আমিও যানে যানে জবাবের পাট চুকিয়ে বেরিয়ে এলাম ।

অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু অর্থাগমের সুযোগ হল । খবর দিয়ে একদিন ডেকে পাঠাল জাহাজের সেই কাপ্টেন । যেটাতে করে আমি আর কি ফিরে এলাম । দেখি একদল মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ হাজির । বণিক সকলে । তাদেরই জাহাজ । আমার বিস্তর প্রশংসন করল । আমি যে রক্ষা করেছি কাপ্টেনকে তথা মালপত্র বোঝাই তাদের জাহাজটাকে, সেজন্যে অজস্র সাধুবাদ দিল । এবং সবশেষে হাতে তুলে দিল দুশ পাউন্ডের নোট । এটা কৃতজ্ঞতার স্মারক । বলল, ক্ষুদ্র এই পারিতোষিক । আপনি নিন । আমি নিলাম ।

ইংল্যান্ডে আর নয়, যাব এবার লিসবনে । সেখান থেকে ব্রাজিল । ক্ষেত তো ছিল সেখানে আমার, সেটার কী অবস্থা দেখার জন্যে কদিন ধরেই মন কেমন করছে । উঠে বসলাম জাহাজে, সঙ্গে আমার চিরসাথী চিরমিত্র ফ্রাইডে । আমার অনুচরও বলতে পারেন । অনুগত বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই ।

পৌছতে পৌছতে পরের বছর এপ্রিল । চেনা জানা কে আর আছে এখানে । সেই কাপ্টেন ? আছেন কি তিনি এখনো বেঁচে । খবর নিয়ে দেখি জীবিত আছেন । বুড়ো হয়েছেন । এখন আর জাহাজ নিয়ে বেরন না । ছেলে হয়েছে এখন কাপ্টেন । সেই সমন্বের বুকে পাড়ি জমায় । তা আমাকে তো কিছুতেই চিনতে পারেন না । আমিও চেহারা দেখে

পারি না ঠাওর করতে। শেষে পুরানো দিনের কথা তুলতে সব মনে পড়ল। তখন পরম্পরকে চিনতে পারলাম।

সে যা আনন্দ তখন! উচ্ছাস! আমার ক্ষেত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন আমি চলে যাবার পর একজন অংশীদার নিয়েছিলেন তিনি ব্যবসায়। পরে তারই হাতে আমার অংশ দেখাশোনার ভার তুলে দিয়েছেন। ন বছর যান নি ব্রাজিলে। ন বছর আগে অন্দি দেখে এসেছেন, সেই অংশীদার বহাল তবিয়তে বর্তমান। আমি যেন গিয়ে তার সঙ্গে যোগাযোগ করি।

মুখে মুখে হিসেব যা দিলেন, তাতে আমার ভাগে বিশ্র অর্থ জমার কথা। তবে যেহেতু দীর্ঘদিন আমার কোনো খবর নেই, আমার অংশের যাবতীয় প্রাপ্তি জমা হয়েছে রাজসভা নিযুক্ত জনৈক অছির হাতে। এরকম নির্দেশ আছে, যদি আমি কোনোদিন না ফিরি তবে সমগ্র প্রাপ্তির এক তৃতীয়াংশ যাবে রাজকোষে, বাকি দুই তৃতীয়াংশ যাবে গির্জার তহবিলে। ফেরৎ এলে সব টাকাই আমার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে টাকার যে অংশ গির্জা দরিদ্র সেবায় বা দানখয়রাতির কাজে ব্যয় করবে, সেটা ফেরৎ পাবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

বললাম, কীরকম প্রাপ্তি হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

বললেন, সঠিক ভাবে বলতে পারব না। তবে অংশীদার যে আমার, তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, কয়েক বছরের মধ্যে সে বিবাট ধনীতে পরিষত হয়েছে। রাজকোষে জমা পড়ে প্রতিবছর যে এক তৃতীয়াংশ, তা নাকি দুশ মোহরের সমান। বললেন, অসুবিধা কি তোমার? তোমার নাম তো সরকারি খাতায় এখনো অংশীদার হিসেবে তোলা আছে। শুধু প্রয়াণ করতে হবে এই যা সমস্য। তাতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। অছি পরিষদে দুজন সদস্য আছেন, আমার বন্ধুসন্মানীয়। আমি তাদের চিঠি লিখে দিছি, দেখ কাজ হবে।

বললাম, কিন্তু অছির হাতেই বা গেল কেন আমার অংশ? এটা তো আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না। আমি তো যাবার আগে আপনার নামে সব উইল করে দিয়ে গিয়েছিলাম। স্পষ্ট তাতে লেখা ছিল আমার অবর্তমানে আপনি যাবতীয় সম্পত্তির মালিক। সেটাকে তারা ঘানবে না কেন?

বললেন, মেনে ছিল, কিন্তু শেষ অন্দি সাক্ষ্য প্রমাণ মেলে নি। অর্থাৎ আমি যে মারা গেছি এটা প্রতিষ্ঠা করা যায় নি। মারা গেলে তবে তো উইলের নির্দেশ বর্তাবে। সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়েছে আমি নির্বাচিত এবং সেই মর্মে আমার যাবতীয় সম্পত্তি অছির হস্তগত হয়েছে। আমি যদি ফের আমার দাবী পেশ করে প্রমাণ করতে পারি আমি জীবিত এবং আমিই সেই লোক, তখন ওরা সম্পত্তি আমার হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।

অছির হাতে গিয়েছে আমার চলে যাবার ছ বছর পর। এই ছ বছর লাভের টাকা তাঁর হাতেই দেওয়া হয়েছে। তার হিসেবও রেখেছেন নিখুঁত ভাবে। সব মিলিয়ে প্রায় চারশ সত্তর মোহর। আক্ষেপ করলেন তাই নিয়ে। বললেন, একটি পয়সাও আমি রাখতে পারি নি। সব গেছে। খরচ হয়েছে কিছু। যেমন ধর তোমার জমিতে কাজ করার জন্যে ক্রীতদাস কিনতে হয়েছে চারজন, আরো টুকিটাকি এটা ওটা খরচ। এই তার তালিকা। বাকি টাকা আমি জাহাজ ব্যবসায় লাগিয়েছিলাম। ডুবে গেছে সে জাহাজ। আমাকে প্রায় সর্বস্বাস্ত হতে হয়েছে। জানি না তোমাকে নগদে শোধ করতে পারব কিনা। তবে ছেলেকে বলেছি, সম্পত্তি বল্ল কষ্টে সামান্য সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সে যে জাহাজ কিনেছে তাতে যেন তোমাকে অংশীদার করে নেয়। যদি লাভ হয়, তুমি তার অর্ধেক পাবে। আর যদি ডুবে যায়

জাহাজ, তবে গেল সব। ধরে নাও এটা তোমার লোকসান।

বললেন, মেই মর্মে অঠিরে দলিল তৈরি করে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আর সিদ্ধুক থেকে ছোট্ট একটা গেঁজে বের করে আমাকে দিলেন। বললেন, এটা রাখ। এই আমার শেষ সংশয়। একশ ষাটটি মোহর আছে। আমি বহুকষ্টে জমিয়ে রেখেছি। এটা তোমারই প্রাপ্য।

বলব কী, চোখে তখন আমার জল এসে গিয়েছে। জমাট বাঁধা অশ্রু। আমার প্রকৃত বাস্তব এই বৃক্ষ ঘানুমটি। কত কষ্ট আজ তাঁর, তবু তুলে দিলেন হাতে আমার প্রাপ্য। কিন্তু কেমন করে নিই আমি এ টাকা? ফেরৎ দিতে চাইলাম, কিছুতে নেবেন না। তখন বললাম, বেশ, এক কাজ করুন, এই ষাটটা মোহর আপনি রেখে দিন আর কাগজ কলম দিন আমাকে। দিলেন কাগজ। লিখলাম, আমার সমস্ত পাওনা সজ্জানে বুঝিয়া পাইলাম। নিচে সই করে লিখে দিলাম তারিখ।

বৃক্ষের চোখে তখন টলটল করছে অশ্রু।



এটা রাখো এই আমার শেষ সংশয়

নিজেকে সংবরণ করতে কিছুটা সময় গেল। বললেন, এক কাজ কর। আমার মাথায় একটা ঘতলব এসেছে। যদি বন্ধুদের দিয়ে কোনো কারণে কোনো কাজ না হয় তার জন্যে নতুন একটা ব্যবস্থা নেওয়া যাক। লিসবন থেকে কদিনের মধ্যে ব্রাজিলের দিকে চলেছে এক জাহাজ। তাতে তোমাকে যাত্রী হিসেবে দেখিয়ে দিই। যেতে হবে না তোমাকে এই মুহূর্তে ব্রাজিল। সেটা আমি ব্যবস্থা করব। আমার বন্ধুর জাহাজ। তুমি যে যাত্রী সেটা এখানকার একজন সরকারি মুখ্যপাত্র লিখে দিক। সেটাও আমিও ব্যবস্থা করব। পরে কোনো আকস্মিক কারণে তোমার যাত্রা বাতিল হবে। জাহাজের কাপ্টেনের হাত দিয়ে ব্রাজিলের রাজদরবারে আর তোমার সেই অংশীদারের কাছে চিঠি দিয়ে দাও। তোমার যাবতীয় প্রাপ্য তারা যেন এই জাহাজেই পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন।

তাই হল। আমি তো তখন যেন ঘোরের মধ্যে আছি। চিঠি দিলাম। তার পর প্রতীক্ষা। সাত মাস পরে দেখি জাহাজ ফিরে এসেছে। তাতে আমার নামে সম্পত্তি বড় একটা পেটি। সে একবারে বিশাল। সঙ্গে চিঠি। আর একটা খামে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

এ পর্যন্ত আমার সমস্ত প্রাপ্তি অর্থের হিসেব ওরা পাঠিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে অর্থও। সেটা পেটির মধ্যে আছে।

ছ বছরে কাপ্তনের হাতে লাভ বাবদ যা দিয়েছিল, তা ছাড়াও আমার যা প্রাপ্তি তা এতদিনে সুদেশুলে হয়েছে ১১৭৪ মোহর।

প্রথম চার বছর অছির হাতে ছিল পুরোপুরি হিসেব নিকেশের ভার। তাতে আমার নামে সঞ্চয় একমে সুদে আসলে মোট ৩২৪১ মোহর।

রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ বিলিবন্টন হয়ে তলানি হিসেবে ঘেটুকু পড়ে আছে তার মূদ্রামূল্য মোট ৮৭২ মোহর। এ ছাড়াও গির্জার কোষাগারে কিছু সঞ্চয় আছে। সেটা আমি যদি দাবী করি তবে তারা দিয়ে দিতে বাধ্য। কিন্তু দাবী করব কি করব না সেটা সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন।

অর্থাৎ বলতে চায় আমি যেন দাবী না করি। তো বেশ আমার অত গরজ কীসের! সৎকাজে ব্যয় হবে টাকা, তাতে পাঁচজনের মঙ্গল হবে, নয় দাবী না-ই কুরলাম। কী এসে যায়।

আর অংশীদার বন্ধুটির চিঠিতে তো কেবল প্রশংস্তি আর আপ্যায়নের ঘটা। কবে যা আমি তারই জন্যে সে নাকি উদ্বীব হয়ে বসে আছে। আমার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করেছে বারবার। সঙ্গে ভেট। পাঠিয়েছে প্রচুর পরিমাণে চিনি আর চুরুট। তারও অর্থমূল্য কম নয়।

মোটমাট এখন আমি রীতিমতো বড়লোক। শুরুটা যে এমন দারুণ হবে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। চিঠি গড়ে আর সব ঘিলিয়ে দেখে আমার তো মাথা ঘুরে পড়ে যাবার দাখিল। হাত পা থরথর করে রীতিমতো কাঁপতে শুরু করেছে। ভাগ্যিস কাপ্তন ছিলেন পাশে, তাই রক্ষা। আমার শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ। তাড়াতাড়ি ব্র্যান্ডির গ্রাস এগিয়ে দিলেন। তাই খেয়ে খানিকটা ধাতস্ত হলাম।

তবে অসুস্থ হল শরীর। সেটা অবিশ্যি পরে। আকস্মিকতা থেকেই এই অসুস্থতা। ডাক্তার ডাকা হল। দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। বললেন, রক্ত নেই শরীরে, রক্ত দিতে হবে। তখন রক্ত দেওয়া হল। তাতে খানিকটা চাঙা হলাম। পরে ধীরে ধীরে অসুস্থতা সম্পূর্ণভাবে কেটে গেল।

আসলে অর্থই ঘটায় মানুষের জীবনে অনর্থ। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এলাম এদেশে,—সভ্য জগতের মাঝখানে, অমনি রক্তশূন্য হল শরীর। কই, থাকতাম যদি দীপে, এসব ধাকমারি কি পোয়াতে হত। আর টাকা হয়েছে বলেই না এত গোলমাল! টাকার জোরেই না এল এতবড় ডাক্তার! ধনী মহারাজ যে আমি এখন। বিশাল বিপুল অর্থের মালিক। প্রায় ৫০০০ স্টার্লিং আমার হাতে। প্রতিবছর হেসে খেলে ফেলে ছড়িয়ে জমা হবে আরো হাজার স্টার্লিং আমার নামে। কিন্তু কী করে খরচ করব এত টাকা!

পফলা কাজ আমার শুভানুধ্যায়ী আমার পরমাত্মার সেই কাপ্তনকে একশ মোহর ফিরিয়ে দেওয়া। জীবনের শেষ সঞ্চয় বলতে গেলে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে। এটা না ফেরৎ দিলে বন্ধুত্বের অসম্মান হবে। দিলাম তাই। কিন্তু এ টুকুতেই সন্তুষ্ট নয় মন। তখন সরকারি উকিল ডাকিয়ে দলিল করলাম। আমার অংশীদার করে নিলাম। নির্দেশ দিলাম এইরকম, যতদিন তিনি জীবিত থাকবেন আমার সাম্বৎসরিক আয় থেকে একশ মোহর করে পাবেন, আর তিনি যারা গেলে পক্ষাশ মোহর করে পাবে তার ছেলে। এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় হবে না।

কিন্তু তাতেও যে বিস্তর টাকা থেকে যায় ! তাও কী কিছু কম ! সেগুলো রাখি কোথায় ! এ তো আর নির্জন নিরালা দীপ নয় যে গুহার এক কোণে অবহেলায় ফেলে রাখব, কেউ দেখবে না, বা দেখলেও হাত দিতে সাহস পাবে না। এ হল খোদ শহর। এখানে নানান বিপদ। টাকা কেড়ে নেবার জন্যে লোক ওভ পেতে বসে আছে। অতএব সে টাকার নিরাপত্তা তো চাই।

তা আমার তো আর ঘরবাড়ি নেই যে নিরাপদে রেখে দেব কোথাও। ভেবে চিন্তে দেখলাম কাপ্তেনেই আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। সেখানেই রাখব কি সব ? কিন্তু তার আগে আরো কিছু করণীয় আছে।

সেই বিধবা, তারও প্রতি আমার কর্তব্য কিছু কম নয়। অসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও আমার অর্থ ফেরৎ দেবার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন। দিয়েছিলেনও একদা। কিন্তু থাকেন যে তিনি লন্ডনে। আর আমি এতদূরে লিসবনে! কীভাবে করব কর্তব্য ? তখন এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। লিসবন থেকে প্রায়ই লন্ডনে তার যাতায়াত আছে। তাকে বললাম আমার হয়ে যেন তিনি বিধবার সঙ্গে দেখা করেন, তাকে আমার এই অনুদান পৌছে দেন। এটা কৃতজ্ঞতার স্মারক। যেন অন্য কিছু মনে না করেন। আর যেন বলে আসেন, ভবিষ্যতেও এ জাতীয় অনুদান তিনি আমার কাছ থেকে পাবেন। নিয়মিত। যেমন করে হোক আমি পাঠিয়ে দেব।

লন্ডনের দুই বোনকেও হতাশ করলাম না। দিলাম শ' পাউড করে দুজনকে। তাদের অবিশ্য অবস্থা ভালো। সাহায্যের দরকার নেই। তবু এই যে আমি পেয়েছি এতগুলো টাকা, খরচ করতে হবে তো !

ব্যস, সব কর্তব্য শেষ। করণীয়ও। সঙ্গে বিস্তর টাকা। কী করব— রেখে যাব ? ঠিক করলাম, না। সঙ্গেই থাক সব। বরৎ কিছু আরো কমিয়ে নিই।

তখন চিঠি লিখলাম গির্জা কত্পক্ষের কাছে। সঙ্গে পাঠালাম আটশ বাহাতুর মোহর। বললাম, এটা আপনার অতিরিক্ত প্রাপ্য। নিয়ে নিন এটা। এর পাঁচশ আপনাদের গির্জার ব্যয়ে লাগুক, বাকিটা দীন দরিদ্রের সেবায় ব্যয়িত হোক।

পাঠিয়ে দেবার পর ঝেঁয়াল হল,— তাইতো কেন পাঠালাম আগে ভাগে ! আমি না যাব বলে ঠিক করেছি ব্রাজিলে। মনের কুমোয় তখন নামিয়ে দিলাম ডুবুরি। খোজখবর করে আমাকে জানাল— মিথ্যে কথা, তোমার মোটে ব্রাজিলে যাবার ইচ্ছে নেই। আসলে মনে মনে ধর্ম নিয়ে তুমি ভারি ঘাবড়ে গেছ। তব আছে তোমার। সেখানে তো সবাই প্রোটেস্টেন্ট। তুমি এদিকে রোম্যান ক্যাথলিক বলে পরিচিত। যদি তাইতে শেষে বাঁধে কোনো গণ্ডগোল :

কথাটা ঠিকই। ধর্ম নিয়ে মনে কিছুটা ভয় আছে বটে। ইদানীং যা সব চলছে ! যদি ঘটনাচক্রে তার শিকার হয়ে পড়ি। যদি এটা বলতে সেটা বলে কাউকে চটাই ! বরৎ থাক, ব্রাজিল নয়, আমি ইংল্যান্ডের দিকে যাই। ধনসম্পদ সব সমেত। সেখানে গিয়েই নয় থিতু হবার চেষ্টা করি।

সেই মর্মে আছি পরিষদকে একখানা চিঠি লিখলাম। আর আমার অংশীদারকে। আমার অংশ তদারকীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাকে দেওয়া হল। অছিদেরকে নির্দেশ দিলাম কোথায় কোথায় বাঁসরিক আয়ের অংশ পাঠিয়ে দিতে হবে সেই মর্মে। অংশীদারকে বললাম, হয়ত ব্রাজিলে কোনোদিনই আমার যাওয়া সম্ভব হবে না। সুস্থির ভাবে আমি জীবনের শেষ কটা দিন কাটাতে চাই। আমাকে যেন ব্যবসার এটা ওটা ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে তিনি

বিবৃত না করেন। ও ব্যাপারে যা ভালো তিনিই করবেন। আমি বছরে বছরে আমার গ্রাসাঞ্চাদনের অর্থ পেলেই নিশ্চিন্ত।

মোটমাটি নির্বাঙ্গটি এখন সব দিক থেকেই। আর কোনো দুশ্চিন্তা আমার মনে নেই। এবার রওনা হব। কিন্তু যাব কোন পথে? জাহাজে চড়তে কেন যেন আর মন চায় না। কী তার কারণ বুঝি না, কিন্তু ইচ্ছেটা যে বাস্তব, তার মধ্যে এতটুকু খাদ নাই— এটা টের পাই।

কি জানি হয়ত সৌভাগ্যের মুখ দেখেছি বলে দুর্ভাগ্যকে বরণ করতে আমার আর ইচ্ছে হয় না। এটা হতে পারে। সমুদ্র যাত্রা তো আমার পক্ষে সুখকর নয়। সেটা এই নিয়ে তিনি তিনবার ভালোভাবেই টের পেলাম। কেন আর তবে অনর্থক বাঙ্গাট।

কাপ্তেনকে বললাম সব। তিনি আমার মতে সায় দিলেন। বললেন, এক কাজ কর। তুমি বরং ইঠাপথে যাও। বিস্তর লোক যায় এই পথে। এখান থেকে সোজা যাবে গ্রোয়েনে, সেখান থেকে বিস্কে উপসাগর পেরিয়ে উঠবে রোশেলে। প্যারিসে যাবার এটাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ। তারপর তো কালে, সেখান থেকে ডোভার। ব্যস, পৌছে গেলে তুমি ইংল্যান্ড। বা যদি মনে কর, কালের পথ না ধরে, তুমি মাদ্রিদের মধ্য দিয়েও যেতে পার। যেটা অনঙ্গপূর্ত হয় আর কি! মাদ্রিদ পেরিয়ে গেলেও সরাসরি ফ্রান্সে পৌছে যাবে।

এর মধ্যে কালে থেকে ডোভার শহুর জাহাজে পাড়ি দিতে হয়, বাকি গোটা পথটাই ইঠাপথ। আমার তো আর কোনো তাড়া নেই। সময় তাচেল। হাত্তি করে নিয়েছি যাবতীয় টাকাপয়সা। সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। সুতরাং এটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ রাস্তা।

সঙ্গীও জুটে গেল। আমি আর ফ্রাইডে তো আছিই। কাপ্তেন যোগাযোগ করিয়ে দিলেন লিসবনের এক প্রথ্যাত ব্যবসায়ীর পুত্রের সঙ্গে। তিনি ইংরেজ। যাবেন তিনি এই পথে। তো মন্দ কি। পরে দেবি আরো দুজন সঙ্গী হাজির। এরাও ইংরেজ এবং বণিক। ইঠা পথে গোটা পথ পাড়ি দেবে। পরে আরো দুজন এসে দলে যোগ দিল। তারা পতুগিজ। প্যারিস অব্দি যাবে। তবু সম্ভাস্ত ব্যক্তি। সঙ্গে একজন আবার ভৃত্য। অর্থাৎ মোট আটজনের দল। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কী হতে পারে!

তা রওনা হলাম। চিন্তা কীসের আমাদের! সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও তো কিছু কম নয়। মোটমাটি সব দিক দিয়েই আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ। আর দল হিসেবে তো অনবদ্য। সবার মধ্যে বয়োজ্যস্থ আমি। সবাই যে কোনো ব্যাপারে আগে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে। আর দুটি ভৃত্য— সদা জাগ্রত তাদের আচরণ। সব সময় আমাকে খুশি রাখার প্রাণান্ত চেষ্টা। এমন সঙ্গ কি আর কারো ভালো না লেগে পারে!

তব্য নেই আপনাদের। ভাববেন না আমি এখন সেই যাত্রার বিশদ বিবরণ দিতে বসব। সেটা আমার ইচ্ছেও নয়। দেখেছেন আপনারা, আমি আমার সমুদ্র যাত্রার গল্প পুঁজ্যানুপূর্বক শুনিয়ে আপনাদের বিবৃত করি নি। সেটা আমার স্বভাবের বাইরে। তবে হ্যাঁ, কয়েকটি কথা অবশ্যই বলব। যাত্রাকালীন অঙ্গুত কিছু রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা। আশা করি তাতে আপনাদের ধৈর্যচূড়ি ঘটবে না।

মাদ্রিদে নিরাপদেই এসে পৌছলাম। পথে কোনো বিষ্ণু হয় নি। সেটা আমাদের পরম সৌভাগ্য। ইচ্ছে ছিল থাকব দুদিন সেখানে, স্পেনের রাজদরবার দেখব, ঘুরে ঘুরে দেখব এটা ওটা দর্শনীয় স্থান, কিন্তু বিধি বাধ। গ্রীষ্মের সেটা শেষ পর্যায়। কদিনের মধ্যে শীত পড়বে। শীত যানে তো বরফ। রাস্তা ঘাট বনবাদাড় বরফে ছেয়ে যায়। সুতরাং সময় থাকতে থাকতে আর দেরি না করে রওনা হওয়া যাবে।

অক্টোবরের মধ্য ভাগ সেটা। এসে পৌছলাম নাভারে। পথে কত ঘানুষ যে সাবধান করল!— খবরদার, এ পথে আর এগুবেন না। বরফ পড়ছে ভীষণ। ঘুরে পাস্পেলুনা দিয়ে যাবার চেষ্টা করুন।

গোটা এলাকাটাই ফ্রান্সের পার্বত্যঞ্চল। পাস্পেলুনাও তাই। তবে পাহাড় সেদিকে তেমন উচু নয়। অর্থাৎ তুষারপাতের সন্তান নাকরে।

তা পৌছে দেখি আবহাওয়া চমৎকার। গরম বেশ। গায়ে পোশাক রাখা দায়। আঙ্কাদে আমরা তো আটখানা। ওয়া, দেখতে না দেখতে পীরেনিজ পর্বতমালার দিক থেকে ছুটে এল এমন একফালি বাতাস। সে যা শীতল আর কনকনে আমি বলে বোঝাতে পারব না। গায়ে ধেন হল বৈধায়। আঙ্গুল টঙ্গুল তো সীতিমতো টন্টন করতে শুরু করেছে।

আর বেচারি ফ্রাইডের যা করুণ অবস্থা! শীতের দেশে থাকে নি তো কোনোদিন। জানবে কী করে শীতের হালচাল! দেখি ঠকঠক করে কাপে স্ট্রিপ্রহর। তবে সে প্রথম দু চার দিন। পরে ধাতঙ্গ হয়ে গেল।

ভীষণ বরফ পড়া শুরু হল অকশ্মাত। আঘার ভাগ্যটাই এরকম। সুস্থ সুস্থ ভাবে কোনো কাজ কি হবার জো আছে! পথঘাট দেখতে না দেখতে বরফের নিচে। কোথাও কোথাও এক কোমর সমান। এর মধ্য দিয়ে কি হাঁটা যায়! বিশদিন সেখানেই রয়ে গেলাম। যদি পরিবর্তন হয় আবহাওয়ার, যদি মেষ কেটে গিয়ে ঝরবারে নীল আকাশের দেখা মেলে! হল না তাও। তখন সবাই মিলে যুক্তি পরামর্শ করে ঠিক করলাম এখান থেকে ফিরে যাব ফন্টারাবিয়ায়, সেখান থেকে জাহাজে করে যাব বোরদোতে। সামান্যই পথ। মোটমাট ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু সমুদ্র যাত্রা নয়।

ঠিক সেই সময় জনৈক ফরাসি ভদ্রলোকের সাথে দেখা ঘুরতে বেরিয়েছেন। গিরিবর্তু পেরিয়ে সিথে এসেছেন এদিকে। যাবেন মাদ্রিদ। বললেন, আমি তো ল্যাঙ্গুইডক হয়ে এলাম। ছোট গ্রাম। অখ্যাত অচেনা। পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এক গাইড। আপনারা তার সাথে যোগাযোগ করুন। তা পথে গেলে আপনাদের কষ্ট আনেক লাঘব হবে। অথবা ঘুরতে হবে না।

অমনি গাইডের খোজে লোক পাঠালাম। দেখা পাওয়া গেল। বললাম আমাদের উদ্দেশ্য। বলল, কোনো অসুবিধে নেই, চলুন, আমি নিয়ে যাব। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে তো?

বললাম, আছে।

—আর শীতের পোশাক?

—তা-ও আছে।

—তবে তো নিশ্চিন্ত। সে আশ্বাস দিল, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। বরফ পড়ে তো ভীষণ। এই সময়ে নেকড়ে গুলো বড় চঞ্চল হয়ে পড়ে। খাদ্যের যে অভাব। তারা হিংস্রভাবে ঝাপিয়ে পড়ে শিকারের ঘাড়ে। বিশেষ একরকম নেকড়ে আছে, তারা দুপায়ে চলে। আমরা বলি দুপেয়ে বাঘ। আর ভদ্রুক আছে। তারাও কম হিংস্র নয়।

আরো কথা বার্তা হল। আরো বারজনের একটা দল পেলাম। সঙ্গে তাদের চাকর বাকর এটা ওটা হরেক জিনিস। দলে ফরাসি স্পেনীয় দুরকম লোকই আছে। তা মন্দ কি! দল ভারি হল তবেই না ভালো। রওনা হলাম।

সেটা পনেরই নভেম্বর। আমার মনে আছে। প্রথমে কিছুটা পিছু হাঁটা। মাদ্রিদ থেকে যে পথে এসেছি সেই পথ দিয়ে পিছোনো। তা বিশ মাইলের কিছু বেশি। দুটো নদী পেরুতে

হল। আর গ্রাম। সমতল অঞ্চল। উষ্ণ আবহাওয়া। পর্বতশীর্ষ থেকে অনেকটা যে নিচে। তারপর ফের ওঠা শুরু। অর্থাৎ যাকে বলে আরোহণ। একটা ঘোড় ঘুরে স্পষ্ট দেখতে পাছি পাহাড়। তাতে শুধু টেউমের পর চেউ। কত যে চূড়া! আর বরফে রয়েছে সব ধপধপে সাদা হয়ে। দেখলে ভয় লাগে। গাইড বলল, এই পাহাড়ের মাথায় না হলেও কাঁধের কাছ দিয়ে আমাদের যেতে হবে।

একদিন সমানে বরফ পড়ল। দিবা রাত্র—মুহূর্তের জন্যেও কামাই নেই। সেদিন আর এগোনো সন্তুষ্ট হল না। উঠে এসেছি এখন অনেক উচুতে। সাবাশ গাইড! আনল এমন পথ দিয়ে তাতে কষ্ট হয় নি এতটুকু। বুঝতে অব্দি পারি নি আমরা এত উপরে এসেছি। এবার নামা। যাকে বলে অবরোহণ। তখনি বরফের মুখে পড়লাম।

তা সে বিপদও কাটল। পরদিন বিকালে। যথারীতি আমরা চলেছি ঘোড়ার পিঠে। নামছি। রাত হতে তখনো ঘন্টা দুই বাকি। একটু ছাড়া ছাড়া ভাব নিজেদের মধ্যে। গাইড চলছে সবার আগে। পিছনে আমরা ছোটো ছোটো উপদলে বিভক্ত। হঠাৎ দেখি বন থেকে বেরিয়ে এল তিনেট নেকড়ে। ভীষণ তাদের আকৃতি। পিছনে পিছনে এক ভল্কুক। সে-ও ঘোর দর্শন। দুটো নেকড়ে চোখের নিমেষে ঝাপিয়ে পরল গাইডের উপর, তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে ফেলে দিল। ততীয়টা লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার উপর। সে কী আর্ত চিংকার গাইডের! ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা হতবাক। বিস্রল যাকে বলে। নইলে কোমর থেকে বের করব পিস্তল, তাক করে ঘোড়া টিপব—পারি না তা-ও!

তখন দেখলাম ফ্রাইডের খেল। সাবাশ ফ্রাইডে! পিস্তল নিয়ে ছুটে গেল নেকড়ের প্রায় মুখের ঘোড়ায়। টিপল ঘোড়া। আগুন বেরিয়ে গেল এক বলক। পরমুহূর্তে দেখি একটা নেকড়ে মরে পড়ে আছে আর বাকি দুটো উধাও। ভল্কুকটারও সেই মুহূর্তে আর দেখা নেই।

সে কী উল্লাস ফ্রাইডের। লাফাতে লাফাতে গিয়ে গাইডকে তুলল। জানি না আরেকটু দেরি হলে কি হত বেচারির। জখম হয়েছে, তবে তেমন খুব একটা নয়। হাতে আর ডান পায়ে দুটো কামড়ের দাগ। ধরেছিল সবে কামড়ে দু দিক থেকে দুই শয়তান। ঠিক সময় মতো ফ্রাইডে গুলি চালিয়েছে। এটা আমার পরম গৌরব। আমরাই অনুচর করল কিনা গাইডের প্রাণরক্ষা, প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিল। সবাই তারিফ করতে লাগল ফ্রাইডেকে।

তবে ঘোড়াটার আর ধড়ে প্রাণ নেই। সব শেষ। মাথাটা পুরো খাবলে নিয়ে গেছে নেকড়ে। পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন মুণ্ডুইন একটা শব। গাইডকে তুলে নেওয়া হল আরেকটা ঘোড়ায়। ঘাবড়ে গেছে বেচারি ভীষণ। একা যাওয়ার আর সাহস নেই।

এদিকে তো আরেক কাণ্ড। গুলির আওয়াজ শোনামাত্র দুধারের বনভূমি যেন সরব হয়ে উঠেছে। সে যে কত গর্জন, কত ডাক, কত চিংকার, কত অন্য রকম হাজারো শব্দ—তার আর ইয়েন্তা নেই। মনে পড়ল আফ্রিকার সেই উপকূল ভাগের কথা। গুলি করে মেরেছিলাম চিতাকে, সঙ্গে সঙ্গে সে কী তর্জন গর্জন বনের ভিতরে। সঙ্গে সিংহের গুরুগন্তীর নিনাদ। তবু রক্ষে এই বনে সিংহ নেই। থাকলে কী অবস্থা হত বলা যায় না।

নেকড়ে পর্ব সঙ্গ হতে ফ্রাইডে এবার পড়ল ভল্কুকটাকে নিয়ে।

সে বড় চমকপ্রদ ঘটনা। চমক এই জন্যে বলি, কেননা ভল্কুক নিয়ে যে অত ঘজা করা যায় আমরা জানতাম না। কতকগুলো অস্তুত গুণ আছে ভল্কুকের আমরা জানি। এমনিতে

শান্তি সদাশয় রীতিমতো ভদ্র জীব। দেখতে বেশ নাদুসন্দুস, হাটেও চেহারার সাথে সঙ্গতি
রেখে দুলকি চালে। নেকড়ের ঘতো লাফাতে পারে না। সেটা সম্ভবও নয়। অমন হালকা
অমন নিপুণ নয় যে দেহ। তবে দুটি বিশেষ গুণের অধিকারী। প্রথমত যাকে তাকে
আক্রমণ করে না। নিতান্ত স্ফুর্ধার্ত হওয়া সত্ত্বেও না। এটা তার ধর্ম। যদি তুমি কর আক্রমণ
তখন সে প্রতি আক্রমণ করতে বাধ্য থাকবে। যদি তুমি জ্বালাতন কর তবে সে পাল্টা
তোমাকে জ্বালাতন করবে। করো না কিছু সে যাবে হেঁটে তোমার পাশ দিয়ে, তোমাকে
ভাস্কেপ মাত্র করবে না। সেদিক থেকে অত্যন্ত ভদ্র। আর একটু এক বগ্গা ধরনের। যে
বরাবর চলেছে, সহসা দিক পরিবর্তন তার ধর্ম নয়। সেখানে তুমি যদি মুখোমুখি পড়ে
যাও, তবে নেমে দাঁড়াও তুমি। বা পথ ছাড়ো। সে তো মহারাজেরও এক কাঠি ওপরে।
সরবে কেন?

আর ইঁয়া, বিপরীতে চলতে চলতে যদি তুমি থমকে যাও, তাকাও তার দিকে, সে-ও
থমকে যাবে, তোমার দিকে তাকাবে। এটা ধর্ম। এবং সেক্ষেত্রে সে ধরে নেবে বিপদের
সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ পিছনে লাগার মতলব আছে তোমার। সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে



আমরা চলেছি ঘোড়ার পিঠে

কখন তুমি পিছনে লাগো। অর্থাৎ উত্ত্যক্ত কর। যতক্ষণ না কর সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে।
মারো তুমি চেলা, সে কিছু বলবে না। কিন্তু চেলা যেই গায়ে এসে পড়বে, সে তোমার
উপর হস্কার দিয়ে লাফ ছাড়বে। সেক্ষেত্রে তোমাকে যতক্ষণ না শায়েস্তা করা হচ্ছে তার
স্বন্তি বা শান্তি নেই। ভীষণ প্রতিহিংসা বোধ ভালুকের।

তা এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম গাইডকে নিয়ে, অন্য দিকে নজর দেবার আর ফুরসৎ হয়
নি। হঠাতে শুনি ফাইডের গগন বিদারী চিৎকার।—পেয়ে গেছি এবার, পেয়ে গেছি! ভারি
উল্লাস তার কঠে। আমাকে বলল, হজুর, মালিক, এবার খেলা দেখাব আপনাদের।
হাসাব। দেখুন চেয়ে ভালো করে। ছাড়ছি না একে।

তাকিয়ে দেবি সেই ভালুক। ঘোর দর্শন। কালো কুচকুচে গায়ের রঞ্জ। কোন্ অবকাশে
আবার বেরিয়ে এসেছে জঙ্গলের মধ্য থেকে। গজেন্দ্রগমনে চলেছে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে

ইটতে।

বললাম, বোকামি করিস নে ফ্রাইডে। জানোয়ার কি বুঝবে তোর মজা? তোকে কামড়ে দেবে, চাই কি গিলে ফেলবে। ফ্রাইডে বলল, মালিক, আপনি দেখুন না, কী মজা হয়। আপনারা হেসে কুটিপাটি হবেন। আমাকে গিলে থাবে কি, উলটে আমিহ ওকে গিলে থাব।

এই বলে চামড়ার জুতো ছেড়ে রবারের জুতো পরল। তাতে বরফের উপর দিয়ে ছুটতে সুবিধে। আর ছোটায় তো ওর তুলনা নেই। কী আর করি আমরা। কুকু নিষ্পাসে হতবিস্তর চিঠ্ঠে তাকিয়ে রইলাম এই ডাকাত ছেলেটার পানে।

ভালুক চলেছে হেঁটে। কোনো দিকে তার অঙ্কেপ মাত্র নেই। কাউকে সে উত্ত্যক্ত করতে চায় না। নিজেকেও কেউ উত্ত্যক্ত করে সেটাও তার কাম্য নয়। ফ্রাইডে ছুটতে ছুটতে তার পিছু ধরল। বলল, এ্যাই, এ্যাই ভালুক। আমি কথা বলছি তোর সাথে। তুই বলবি না কথা?

বলবে কী করে? ভালুক কি বোবে মানুষের ভাষা! হেঁটে চলল সে একই ভাবে। ফ্রাইডে ঠিক তার পিছন পিছন। আমারও কৌতুহলী জনতা চললাম তাদের পিছু পিছু।

সে এক ঘন জঙ্গল। ফ্রাইডে ঢিল ছুড়ল। ঠিক করে পড়ল গিয়ে তার মাথায়। তেমন আঘাত না। কিন্তু ঐ—উত্ত্যক্ত করেছ কি রক্ষা নেই। আর যায় কোথায়! অমনি চকিতে ঘূরে ফ্রাইডেকে দেখল। সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে ফ্রাইডে দৌড়। সে এক রীতিমতো প্রতিযোগিতা যেন। ভালুকের পায়েও সমান তেজ। আর ঘোৎ ঘোৎ করে সমানে। আমরা তো ভয়ে থ। কী হবে এখন কে পারে বলতে! ধমক দিলাম ফ্রাইডেকে।—ফ্রাইডে, এখনো গুলি কর। নয়ত মুশকিলে পড়বি। তুই না পারিস আমরা করছি গুলি।

ফ্রাইডে ততক্ষণে ছুটে তড়বড়িয়ে উঠে পড়েছে একটা গাছে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, মালিক, গুলি করার দরকার নেই। আপনি দেখুন না কত মজা হয়। হাসতে হাসতে আপনাদের পেটে খিল ধরে থাবে।

বলে অস্তুত ক্ষিপ্তায় আরো খানিকটা উচুতে উঠে বসে গেল একেবারে মগ ডালে। তারপর তার এক প্রাণ্টে বসে ঘনের আনন্দে পা দোলাতে লাগল।

হঠাত দেখি ভালুক মহারাজও গাছ বেয়ে উঠছেন। অস্তুত তারও ক্ষিপ্তা। ঠিক মানুষ যেভাবে উঠে হ্রস্ব সেইরকম। আর ঘোৎ ঘোৎ শব্দ। ভাবখানা এখন—দাঁড়াও না বাছাধন, দেখাচ্ছি তোমার মজা। ভেবছ কী।

তা নিমেষের মধ্যে দেখি ফ্রাইডে যেখানে প্রায় তার কাছাকাছি হাজির। মাঝখানে শুধু একখানা ডালের ব্যবধান। এগোবে বলে পা বাড়িয়েছে সবে, অমনি শুরু হল ফ্রাইডের বজ্জাতি। আমাদের বলল, দেখুন আপনারা, ভালুক যশায় কত সুন্দর নাচতে পারেন। বলে সেই ডাল ধরে সে কী নড়াবার ঘটা! বেচায় ভালুক তো এই পড়ে কি সেই পড়ে। ঘন ঘন পিছন দিকে তাকায়। আর আঁকড়ে ধরে জ্বরসে ডাল। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে নাচের ভঙ্গিতে শরীর। আমরা তো হেসে কূল পাই না।

তখনো শেষ হয় নি আর কি বজ্জাতি। হঠাত থামল ফ্রাইডে। অমনি নাচও বন্ধ। দেখি তাকিয়ে আছে দুজন চোখে চোখে। ফ্রাইডে বলল, কীরে, আসবি না আরেকটু কাছে? আয়! যেন ভালুক নয়, মানুষ ও। ফ্রাইডের সব কথা বোবে। দেখি অবাক কাণ, ডাক শোনার পর সেও গুটিগুটি এগোবার চেষ্টা করছে, তখন ফের দুলুনি। ফের নাচ। ফের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ভাব।

ফ্রাইডে বলল, কী রে, আর আসবি না? তবে দেখ এখন আমি কী করি! বলে ডালে পা রেখে নিচের দিকে নামতে নামতে ঝুলে পড়ে হঠাতে এক লাফ। সোজা মাটির উপর। আমরা তো ধরে নিয়েছি ভালুকও পড়বে লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে। ওমা, দেখি লাফের ধার কাছ দিয়েও যায় না। গুটি গুটি ডাল আঁকড়ে ধরে পিছু হচ্ছে নামল গুঁড়ি বেয়ে মাটিতে। ঠিক যেমন নামে বিড়ল। আগে পিছনের পা দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। দাঁড়াল শক্ত হয়ে। তারপর নামিয়ে দিল সামনের পা দুখানা।

আর ফ্রাইডে তো আগেই সেখানে হাজির। নামার সাথে সাথে কানের ফুটোয় পিস্তল ঢুকিয়ে দৃঢ়। বিশাল দেহ পপাত ধরণীতলে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের। সে যেন চৰম উৎকর্ষ। কী হয় কী না হয় তাই নিয়ে অবিরাম সমস্যা। হেসেছি ঠিকই, কিন্তু সভয়ে। যদি একটা কিছু ঘটে যায়!

ফ্রাইডেকে বললাম, তা হ্যাঁরে ফ্রাইডে, এই যে করলি সব এতক্ষণ ধরে, যদি হঠাতে বেঁচাস একটা কিছু হয়ে যেত! যদি বাঁপিয়ে পড়ত তোর ঘাড়ে!

বলল, পড়বে কী করে! আমি যে জানি সব। আমাদের ওখানে এইভাবেই তো ভালুক মারে।

বললাম, মিথ্যে কথা। তোরা পিস্তল কোথায় পাবি যে এইভাবে মারবি ভালুক?

বলল, পিস্তল ছাড়া বুঝি কিছু মারা যায় না। আমাদের যে তীর আছে। তার কি তেজ কম?

খেয়াল করিনি এতক্ষণ, দ্বিতীয় গুলির আওয়াজ হ্বার সাথে সাথে গর্জন যেন আরো দশগুণ বৃদ্ধি পেল। গলা খাকারির মতো ডাকে নেকড়ের দল। স্পষ্ট সে ডাক আমাদের কানে এসে পৌছেছে। আরো নানান ডাক। বাড়ছে ক্রমশ শব্দ। এদিকে বেলা প্রায় শেষ। গাইড বলল, চলুন আর দেরি করা ঠিক না। অনেকটা পথ যেতে হবে এখনো। তবে বিপদ কাটবে। সামনে আরো একটা ভয়ের এলাকা আছে।

ফ্রাইডে বলেছিল নিয়ে যাবে সাথে ভালুকের বিশাল চামড়াটা। আমরা রাজি হই নি। সময় লাগবে প্রচুর। ততক্ষণে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

বরফের এলাকা তখনো পার হতে পারি নি। দুধারে গহীন বন। দূরে দেখা যায় সমতল ভূমি। সেখানে চাষের জমি, পুকুর, ছোটো ছোটো বাড়ি।

পরে শুনেছিলাম, বরফের সময়ে এই সব গ্রামে মানুষ বড় অসহায় অবস্থায় দিন কাটায়। নেমে আসে বন থেকে যাবতীয় হিংস্র জঙ্গ জানোয়ার। ক্ষুধার তাড়নায় গরু মোষ ছাগল ভেড়া যা সামনে পায় নিয়ে যায় মুখে করে। কত মানুষও মারা যায়।

গাইড বলল, সামনে যে বন তাতে এত নেকড়ে, দেখলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। পৃথিবীর যাবতীয় নেকড়ে হয়ত এই বনেই আছে। চলুন তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করি।

সূর্য তখন অস্তাচলে। ঘোর ঘোর ভাব। জঙ্গলের প্রথম অংশে তখন আমরা। ঝুঁক্দি নিষ্পাসে চলেছি এগিয়ে। হঠাতে সামনে দেখি পাঁচটা নেকড়ে। দল বেঁধে চলেছে একদিক থেকে আরেকদিকে। আমাদের জঙ্গে মাত্র করল না। হয়ত সন্ধান পেয়েছে মড়ির। কোনো জানোয়ার হয়ত মরে পড়ে আছে জঙ্গলের কোনো প্রাণে। তারই সন্ধানে চলেছে দিঘিদিক জ্বানহারা অবস্থায়।

গাইড বলল, সাবধান। যে যার অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। বিপদ যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিক থেকে আসতে পারে।

সেটা অবিশ্যি বলার অপেক্ষা রাখে না। অঙ্ককার নামার সাথে যে যার হাতে খুলে
রেখেছি অস্ত্র। আর সতর্ক সজ্জাগ চোখ। অঙ্ককারে ঘটটুকু দেখা যায় চেষ্টা করছি তার
চেয়ে আরো বেশি দেখতে।

প্রায় এক ক্রোশ পথ নিরাপদেই পার হলাম।

একটু ফাঁকা মতো জায়গা এরপর। দুধারে বন। দেখি যস্ত ভিড় সেখানে। পড়ে আছে
পথেরমাঝে মরা একটা ঘোড়। তাকে ধিরে প্রায় উজন খানেক নেকড়ে। মহানন্দে চলছে
তাদের ভোজ।

পাশ কাটিয়ে একটু ঘূর পথ ধরে জায়গাটা পার হয়ে গেলাম। দরকার কী বাপু ওদের
বিরক্ত করার। ফাইডে দু তিনবার আমার কানের কাছে ফিসফিস করল,—দেব চালিয়ে
গুলি? মালিক, আপনি শুধু একবার হৃকুম করুন। হাত আমার নিশপিশ করছে। বললাম,
না। খবরদার এদের চাটিয়ে দিলে এখন বিপদের আশঙ্ককা। সামনে জঙ্গল আরো ভয়ঙ্কর।
তবে আর জান নিয়ে বেরতে পারব না।

সত্যিই ভয়ঙ্কর সেই সামনের জঙ্গল। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির তো আর বিরাম নেই।
এসে পড়েছি এবার জঙ্গলের প্রায় মাঝ বরাবর। হঠাৎ ডাইনে চোখ পড়তে দেখি সে প্রায়
শখানেক নেকড়ে। দল বেঁধে সশ্মস্ত্র সৈনিকের মতো আমাদের দিকে গুটি গুটি এগিয়ে
আসছে। কী করি এখন! হঠাৎ মতলব খেলে গেল মাথায়। সবাইকে বললাম, তোমরাও
সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়। দাঁড়াল তাই। কিন্তু তাতে কি আর ভবি ভোলে। দেখি
একই কদমে ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। তখন বললাম, অস্ত্র তুলে ধর। ধরল সবাই
তাক করে পিস্তল। বললাম, একজন অস্ত্র একজন আমি এক, দুই, তিন বলার সাথে
সাথে গুলি চালাবে। তারপর খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বাকিরা। এই অবকাশে যেন আগের
তরফের পিস্তলে নতুন গুলি ভরা হয়ে যায়।

তাই হল। ছুটে গেল তিন বলার সাথে সাথে এক ঝাঁক গুলি। তাতে মারা পড়ল কটা।
আর বিস্তর জখম। থমকে দাঁড়িয়েছে তখন পুরো দল। ফের বললাম তিন,—অমনি
আরো একঝাঁক গুলি। মারা পড়ল আরো কটা। আর জখমের সংখ্যা এবার আগের চেয়ে
বেশি। তখন দেখি একজন দুজন করে পিছু হটতে শুরু করেছে। শেষে পুরো দলটাই মুখ
ফিরিয়ে দে দৌড়। অমনি আমরাও সমবেত চিৎকার করে দিলাম তাড়। এটা শুনেছিলাম
ছোটো বেলা। জন্মদের উদ্দেশ করে ধ্বনি দিলে নাকি তারা ভয় পেয়ে যায়। পালাতে শুরু
করে। পরখ করার সুযোগ হল এতদিন পরে। ভুল নয় কথাটা। বলতে গেলে অক্ষরে
অক্ষরে ঠিক।

এই অবকাশে ফের গুলি ভরে নেওয়া হল পিস্তলে। সময় তো নষ্ট করা যায় না।
বিপদ যে কোন্ দিকে আসে কে বলতে পারে। আগাগোড়া বনটাই যে নেকড়ের বন।
বলেছে গাইড। কথাটা যে নির্ভুল তার প্রমাণ তো দেখতে পাচ্ছি।

রাত আরো বেড়েছে। ঘুটঘুটে অঙ্ককার চতুর্দিকে। আলো বলতে আমাদের হাতের
মশাল আর ধপধপে সাদা বরফ। বরফের উপর দিয়ে একটা খরগোশ নড়লেও টের পাই।
চলেছি চারদিকে নজর রাখতে রাখতে। হঠাৎ দেখি সামনে পিছনে ডাইনে তিন পাল
নেকড়ে। তবু বাঁচোয়া ঘাড়ে এসে পড়ে নি কেউ। আমরা দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

কিন্তু বরফের উপর দিয়ে আমরা চাইলেই তো আর দ্রুত ছোটা সন্তু নয়। পা ঢুকে
যায় বরফে। সেইভাবেই ভয়ে ভয়ে চলেছি। সামনে আরেকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর
বন। তাতে ঢুকব এবার। দেখি পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একপাল নেকড়ে।

ঠিক তখনি কানে এল বন্দুকের আওয়াজ। যাত্র একবার তারপর সব চুপ। শুধু হাঁউমাঁট করে ডাকছে নেকড়ের দল। আর ভারি যেন উল্লসিত। একটু পরে দেখি ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া। মরণ ভয়ে দিঘীদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটছে। তার পিছনে ঘোল সতেরটা নেকড়ে। পারে কি তাদের সাথে পাঞ্চা দিতে। একটু পরে দেখি ঘোড়া ছিটকে পড়েছে মাটিতে, আর তাকে ছেঁকে ধরেছে নেকড়ের পাল।

কিন্তু কে ছুড়ল বন্দুক? নির্যাং আমাদেরই মতো কোনো পথচারী। কিন্তু কোথায় সে? কী তার অবস্থা?

বেশি দূর এগোবার দরকার হল না। হাতের মশালে দেখি মাটিতে পড়ে আছে দুটি মানুষ। একজনের হাতের নাগালের মধ্যে বন্দুক। এখনো ঘোঁয়া বেরছে বন্দুকের নল দিয়ে। তবে তারা আর জীবিত নেই। একজনের মাথাটা ছিন্ন বিছিন্ন। আরেক জনের নিম্নাঙ্গ পুরোপুরি উধাও। সে এক বিত্তিকিছিরি অবস্থা। নেকড়ের পাল চারপাশে ঘিরে ধরেছে দুজনকে।

তাড়াতাড়ি সরে এলাম সেখান থেকে। ভয় করছে। বা ভয় নয়। প্রচণ্ড আতঙ্ক। বুক কাঁপছে। যদি আমাদেরও ঐ দশা হয়। সামনে এখনো সেই নেকড়ের পাল। তিনশ হবে মাথা গুনতি। দাঁড়িয়ে আছে পথ জুড়ে। করি কী এখন!

উপায় একটা হল। টেন্ডুরের দয়া ছাড়া একে কীই বা বলা যায়। দেখি অদূরে গাছ কেটে রেখেছে অসংখ্য। গুড়িগুলো পড়ে আছে পথে। নিয়ে যাবার হয়ত সুযোগ পায় নি। এই তো আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র পথ!

দলবল মিলে ঠাঁই নিলাম সেই গুড়ির আবেষ্টনীর মধ্যে। মশাল জ্বালাম আরো কটা। ত্রিভুজাকারে বসেছি সকলে। ঘোড়াগুলো আমাদের মাঝখানে। অর্থাৎ, মারতে হলে মারো আগে আমাদের, তারপর ঘোড়াগুলোকে নাও। কিন্তু আমাদের মারাটাও আর সহজ নয়। চারদিকে চোখ আমাদের। হাতে দুটো করে পিণ্ঠল। আর প্রচুর গোলা বারুদ। তদুপরি সামনে গুড়ির বেষ্টনী। পারবে কি বাপু আমাদের সঙ্গে টুকর দিতে?

এল তবু রাগে গর্জাতে গর্জাতে। আমরা আগের নিয়মে গুলি ছুড়লাম। অর্থাৎ সকলে একসাথে নয়, একজন অন্তর একজন। তাতে মারা পড়লো কটা। আহত হল তার প্রায় দ্বিশৃণ। তবু দেখি ভয়ে পালাবার নাম নেই। আহতদের ঘাড়ের উপর দিয়ে আসছে আরো একদল। তখন ফের গুলি ছোড়া হল।

গুনে দেখলাম এবার মরেছে মোট আঠার কি বিশটা। জখম প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু এ যে রক্তশীজের বৎশ। নির্ভয় নির্বিকার। রাগে ফুঁসছে বাকিরা। মৃতদেহ ডিঙিয়ে এগিয়ে আসছে। নজর আসলে ঘোড়াগুলো। আমরা আড়াল করে আছি তাই আমাদের উপর আক্রমণ।

কিন্তু না, আর গুলি করে এদের রূখবার চেষ্টা করা বাতুলতা। অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। একজন ভ্রত্যকে বারুদের ঠোঙ্টা দিয়ে বললাম, চটপট ছড়িয়ে দে তো বারুদ চারধারের গুড়িগুলোর উপর। দিলো তাই। নেকড়ে দলের বাকিরা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঢ়িয়ে হয়ত ঠিক করছে তাদের পরবর্তী কর্মপদ্ধতি কী। সে যৎসামান্য অবকাশ। তাই মধ্যে আমাদের কাজ খতম। এগিয়ে এল ফের। অমনি মশাল দিয়ে বারুদের এক ধারে লাগিয়ে দিলাম আগুন। দাউ দাউ করে ব্যাপ্ত হয়ে গেল চোখের নিমেষে চারধারে। এসেছিল যে কটা তাদের বেশির ভাগ গরমের তাপ পেয়ে বলসে গেল বা ঠিকরে ছুটে পালাল। সেদে করে দুকল তবু কটা দুঃসাহসী। আমরা গুলিতে চোখের পলকে তাদের

নিকেশ করলাম। বাকিরা দেখে ভয়ে পিছতে শুরু করেছে।

তখন ফের একবার গুলি আর সেই সাথে মুখে হাত নেড়ে রে রে আওয়াজ। অমনি লেজ গুটিয়ে সবাই দে দৌড়। বিশটার মতোন দেখি মাটিতে পা ঘস্টাতে ঘস্টাতে পালাবার চেষ্টা করছে। জখম হয়েছে পা। তাই ছুটতে অক্ষম। তখন ঝাপিয়ে পড়লাম তলোয়ার হাতে। কচাকচ একেকটা খতম। আর সে যেন হুটোপাটি লেগে গেছে তখন বনের মধ্যে। দুদ্বাদশ শুধু ছোটার শব্দ পাই। আর তাহি তাহি ডাক। অর্থাৎ পালাচ্ছে দলবল। এত ম্ত্যু এত জখম, সর্বোপরি আগ্নের ঐ ঘেরাটোপ—ভয় না পেয়ে কি যায়! একদলকে পালাতে দেখে প্রত্যাশায় আশে পাশে যারা লুকিয়ে ছিল, তারাও লেজ গুটিয়ে দে ছুট।

মেটমাট কিছুটা নির্ভয় এখন। পালাতে যখন শুরু করেছে সহসা এদিকে যে আর আসবে না সেটা সহজে বোঝা যায়। তা হিসেব করে দেখি, মেরেছি প্রায় তিন কুড়ি ষাটটার মতো নেকড়ে। আর জখম যে কত তার তো ইয়েত্তা নেই। দিনের আলো থাকলে মারতাম আরো ঢের। রাত বলে তবে না মাত্র এই কটা! এখনো যেতে হবে প্রায় এক ক্রেশ। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ। তবে আসবে গ্রাম। হাঁকড়াক চলছে চারধারে মালুম পাই, তবে ধারে কাছে কেউ আর যেইসে না। অর্থাৎ ব্ববর পৌছে গেছে নিজেদের মধ্যে। আমরা যে ভয়ঙ্কর, কিছুতে বাগে আনা যাবে না আমাদের এটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। প্রায় ঘন্টাখানেক একনাগাড় ঘোড়া ছোটলাম। তবে দেখি জঙ্গল শেষ। বরফও শেষ। সামনে ছোটো ছোটো কুটির। বাঁক বেঁধে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের জোয়ানের দল। হাতে সকলের অস্ত্র। আর চেখে ভয়ের ছাপ। জঙ্গলের হাঁকড়াক তো তাদেরও কানে গেছে। ভয়ে ত্রাসে আতঙ্কে বেরিয়ে এসেছে তাই দল বেঁধে। গ্রামে যে মাঝে মাঝেই হানা দেয় নেকড়ের পাল। নিয়ে যায়, ছাগল গরু মোষ ঘোড়া, এমনকি কখনো কখনো মানুষও। তাই তো পাহারা দেবার এই প্রথা।

কাটিল রাত। দেখি গাইড আমাদের রীতিমতো অসুস্থ। পা আর হাত ফুলে উঠেছে তোল হয়ে। এগোবার সামর্থ্য আর নেই। এমতাবস্থায় তাকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা বৃথা। তখন রেখে গেলাম তাকে গ্রামে। নিলাম আরেকজন গাইড। সকালে রওনা হয়ে বেলা থাকতে পৌছে গেলাম তুলুতে। সে বড় চমৎকার জায়গা। আবহাওয়া বেশ উষ্ণ। শীতের বালাই নেই। নেই এতটুকু তূষার কি একটাও নেকড়ে। নগরবাসী দুচারজনের সঙ্গে আলাপ হল। বললাম আমাদের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অমণের বৃক্ষস্ত। বলল, অবাক কাণ্ড, কেমন গাইড ধরেছিলেন আপনারা! ভারি তো দুঃসাহস তার! আর দুঃসাহস বটে আপনাদেরও। স্বেফ বুদ্ধি আর সাহসের জোরে বেঁচে ফিরে এসেছেন। নইলে এই সময় ঐ পথে কোনো মানুষ ফিরতে পারে না। নেকড়ের পেটে যায়। আসলে নজর ওদের ঘোড়ার দিকে। ঐ যে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে পথিক, দেখলেই ওদের জিভ লোভে চকচক করে। ক্ষিদেয় যে মরিয়া তখন। ঘিরে ধরে সাথে সাথে। সওয়ারীও একই সাথে সেই লোভের শিকার হয়।

চুপিচুপি বলি আপনাদের, ভয় যে আমিও পাই নি, এটা মোটেও হক কথা নয়। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তিনশ নেকড়ের অমন বিরাট দল, অমন লোলুপ হিংস্র চেহারা আর অত গর্জন—ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে শুধু নেকড়ে আর নেকড়ে—আমি জীবনে কখনো দেখি নি বা দেখব যে কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি। আরেকটু হলে আমারও বুদ্ধি প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। নেহাত মনের জোর প্রবল তাই পেরেছি ঐভাবে নিজেকে এবং সেই সাথে গোটা দলটাকে রক্ষা করতে। সেটা সেই লোকটিও বলল।—যদি না ঐভাবে বুদ্ধি করে

ভাগে ভাগে শুলি চালাতেন, তবে আর এতক্ষণ এখানে বসে গল্প করতে হত না। হাড় কথানা পড়ে থাকত জঙ্গলের ঘাবো।

শূরে শূরে দণ্ডবৎ হই বাপু নেকড়ের দল। এমন জঙ্গল আমার মাথায় থাক। আমি বরং হাজার বার যাব সমুদ্রে, ঝড়ের মুখে পড়ব, চাইকি জীবন দেব সমুদ্রের গভীরে। তবু জঙ্গলমুখো আর কখনো হব না।

জাহাজে করে গেলাম ফ্রান্সে। উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটে নি। সেখান থেকে এলাম কালেতে। তারপর ডোভার। সেটা জানুয়ারি মাসের চৌদ্দ তারিখ। আমাদের দীর্ঘ যাত্রার সমাপ্তি হল।

এবৎ সর্বাঙ্গীণ কুশল। শরীরের দিক থেকে তো বটেই এমনকি অর্থ ইত্যাদির দিক থেকেও। ছন্দি করে এনেছি। সেটা ভাঙতে এতটুকু অসুবিধে হল না। বিশ্রাম টাকার মালিক আমি এখন। গেলাম কাপ্তনের সেই বিধবার সাথে দেখা করতে।



চুটতে চুটতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়া

কী যে খুশি মহিলা! টাকা পাঠিয়েছি, পেয়েছেন, তার জন্যে কত দিলেন ধন্যবাদ। কত শুভেচ্ছা। কী যে করবেন আমার জন্যে, কী আনবেন, কী খাওয়াবেন, তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। দরদে বুক ভরে গেল আমার। আর শুক্রা। আর ভালবাসা। যেন যা আমার। মাত্ত্বের ছোঁয়াচ পাই তার প্রতিটি কাজে।

পারি তো এর জিম্মায় সব কিছু রেখে লিমবনে চলে যেতে। অসুবিধে কী আমার! সেখান থেকে যাব ব্রাজিল। ব্যবসার কাজে দেখাশুনা করব। কিন্তু যুরে ফিরে সেই যে ধর্ম চিন্তা! তাই নিয়ে ভয়! যা গোলমাল লেগেছে চারধারে,—যদি তার রোষে পড়ি। যদি কিছু একটা ঘটনা ঘটে!

মোটমাট এইভাবে শহীদ হতে আমি চাই না। কিছু একটা করব, তার জন্যে মরব—সে আলাদা কথা। কিন্তু করব না কিছু, আমাকে হত্যা করবে, এ আমার অভিশ্রেত নয়। চাই না কোনোরকম বাঞ্ছাটে জড়াতে। এখন খিতু হতে মন চাইছে। বাসা বাঁধব এখানে। এখানেই থাকব। সংসারী হব। ব্যবসা বরং বিক্রি করে দিতে বলি।

অংশীদারকে চিঠি লিখে নতুন নির্দেশ দিলাম। দিক বেচে সব কিছু। তবে দুটি যাত্রা শর্ত। আমার শুভানুধ্যায়ী লিসবনের সেই কাপ্টেনকে দিতে হবে বছরে একশ মোহর করে অনুদান, তারপর সে মারা গেলে তার ছেলেকে পঞ্চাশ মোহর করে আজীবন। এর জন্যে দাম যদি কিছু কম হয়, তাও রাজি। বেশি টাকায় আমার লোভ নেই।

ক মাস পরে পেলাম চিঠির জবাব। লিখেছে শর্তে রাজি। দুজন বগিকের সঙ্গে সে কথা বলছে। তারা কিনে নেবে আমার অংশ। এক একজন দাম দেবে ব্রাজিলের মুদ্রায় চালিশ হাজার তৎকা। আমি লিখে দিলাম, রাজি। তাড়াতাড়ি কর।

আট মাস লাগল মোট সময়। টাকা পাঠাল হ্রস্ব করে। সব জমা রাখলাম কাপ্টেনের বিধবার কাছে। নিশ্চিন্ত এখন। প্রথম জীবনের যা কিছু অভিযান, তার এতদিনে সমাপ্তি। চাষের জমি করাটাও যে পড়ে সেই অভিযানের মধ্যে। তাই তো দিলাম সে পাট চুকিয়ে।

কিন্তু চাইলেই কি পারি আমি স্থির হয়ে একজ্ঞায়গায় থাকতে। এটা যে আমার অভ্যেসের বাইরে। ইচ্ছ হয় ফের ভেসে পড়ি সমুদ্রে। যাই সেই দ্বীপে। বড় দেখতে ইচ্ছে হয় কেমন করে আছে সেই কজন। স্পেনীয় নাবিকদেরও তো এতদিনে দ্বীপে আসার কথা। এল কি তারা? সহজভাবে মেনে নিতে পেরেছে তো ওরা তাদের? জানতে বড় ইচ্ছে করে।

মহিলার কাছে ব্যক্ত করলাম আমার মনের কথা। তিনি মানা করলেন। সাতটা বছর কিছুতে দিলেন না আমাকে চোখের আড়াল হতে। যাতে মন বসে এখানে আমার, আমার দুই ভাইপোকে এনে দিলেন আমার কাছে। বালক তারা। বললেন, এদের ভার এবার থেকে তোমার। এদের মানুষ কর।

তা কাটল বেশ কটা বছর ভালোই। কিছু জমি কিনলাম। এক ভাইপো ততদিনে বেশ বড়সড় হয়ে উঠেছে। উপযুক্ত এখন। দলিল করে তার নামে দিলাম জমির কিছুটা অংশ। যতদিন বেঁচে থাকব আমি সে আমার হয়ে তস্ত্বাবধায়কের কাজ করবে। মৃত্যুর পর হবে পুরোপুরি মালিক। দলিলে সেই মর্মেই নির্দেশ থাকল। ছোটেটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে লাগিয়ে দিলাম এক জাহাজের কাজে। সুরল এধার শুধার বিস্তর। পাঁচবছর পর দেবি পুরোদস্তুর কাপ্টেন বনে গেছে। আর ভীষণ সাহসী। তখন সে জাহাজ থেকে সরিয়ে তাকে জুড়ে দিলাম আরেক জাহাজে। এটা দূর পাল্লার জাহাজ। সমুদ্রে যায়। তাতে তার খুব আনন্দ। ক বছর পর আমাকেও জাহাজে তার সাথী করে নিল।

বলতে ভুলে গেছি, ইতোমধ্যে আমি সংসারী হয়েছি। বিয়ে হয়েছে আমার। তিনটি সন্তানের আমি জনক। দুটি ছেলে এক মেয়ে। হঠাৎ স্ত্রী অসুখে মারা গেল। মন তখন খারাপ। ঠিক সেই সময় ভাইপো ফিরে এসেছে জাহাজ নিয়ে। কদিনের মধ্যেই রওনা হবে স্পেনের দিকে। আমাকে বলল, যাবে নাকি তুমি? বললাম, চল।

সেটা ঘোলশ চুরানবই সাল। আমি বৃদ্ধ তখন। তবু ঐ যে বলে মোহ। দ্বীপ দেখার আদম্য আগ্রহ। আমি যে মালিক সে দ্বীপের। রেখে এসেছি প্রজাদের। কেমন ভাবে চলছে তাদের দিন? আমার সাজানো বাগানে কী কী নতুন গাছ তারা লাগাল? ভারি দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

গেলাম দ্বীপে।

দেবি দিব্য জ্ঞানিয়ে বসেছে স্পেনীয় নাবিকের দল। আমাকে দেখে হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানাল। বলল সব। আমি চলে আসার কদিন পরেই তারা এসে পৌছয়। প্রথমে তো সেই দুটো দুষ্মন—জাহাজের সেই বিদ্রোহী বদমাশ—কিছুতে রেয়াত করবে না

তাদের। খটামাটি লাগে মুহূর্মুহু। পরে মেনে নিল। ফের আবার ঝগড়া। ফের বিদ্বেষ। শেষে অস্ত্র ধরল নাবিকদের দল। শাসল। তখন ঠাণ্ডা। মানতে বাধ্য হল তাদের। সেই থেকে আর নিজেদের মধ্যে কোনো গোলমাল হয় নি। ক্ষেত্র খামার বাড়িয়েছে। খেটেছে অরুণাঞ্জ। সোনা ফলে যে দ্বীপে! জমি খুব উর্বর। তবে না শাস্তি।

তারপর যুদ্ধ। নিজেদের মধ্যে নয়, ক্যারিবীয়দের সঙ্গে। বেশ কয়েকবার। এসেছিল দল বেঁধে দ্বীপে দখল নিতে। পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে। তখন তারা বুদ্ধি করে গেল একদিন বর্বরদের রাজ্য। নৌকোয়। সেখানেও যুদ্ধ। বন্দী করে আনল মোট ঘোলজনকে। তাদের মধ্যে পাঁচজন স্ত্রীলোক। লোক যে দরকার তখন অনেক। তাইতো এই ফন্দি। তাতে জনসংখ্যা বেড়েছে। আমি নিজের চোখে বিশ্বিত বালক বালিকাকে দেখে এলাম।

রইলাম বিশ দিন। আসার সময় দিয়ে এলাম একপ্রস্থ পোশাক, সঙ্গে কাজের নানান যন্ত্রপাতি, গোলা বাবুদ, অস্ত্র আর দুজন মিস্ত্রী। এদের আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি এই উদ্দেশ্যেই। একজন ছুতোর আর একজন কামার। গঠনের নানান কাজ যে দরকার। উপযুক্ত লোক নাহলে তা কি করা সম্ভব!



..... পাহাড় সমান উচু একটা ঢেউ

হ্যাঁ, আরো একটা জরুরি ব্যাপার চুকিয়ে এলাম। সেটা দ্বীপের মালিকানা নিয়ে। দলিল তৈরী হল। লিখিত বিবরণ যাকে বলে। দলিলে আমিই সর্বেসর্ব। দ্বীপের অধিপতি। ওদের দিলাম ভাগে ভাগে এক একটা এলাকা। সেটাও পরম্পরারের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে। অর্থাৎ আমি চাই সুস্থ বিলিবন্টন ব্যবস্থা। এখানে কোনোরকম অসাম্যের আমি পক্ষপাতি নই।

ফেরার পথে ব্রাজিল হয়ে ফিরলাম। মালবাহী জাহাজ কিনলাম একখানা। সেই ব্রাজিলেই। তাতে লোক তুললাম বিস্তর। বলা কওয়া করেই। লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই। রওনা করিয়ে দিলাম দ্বীপের উদ্দেশ্য। সঙ্গে দিলাম নানান পসরা। আর সাতটি মেয়ে। এদের দরকার। দ্বীপের নানান কাজ—আরে বাপু ঘর গেরহালি বলেও তো একটা জিনিস আছে। সেটা এবা ছাড়া কে করবে?

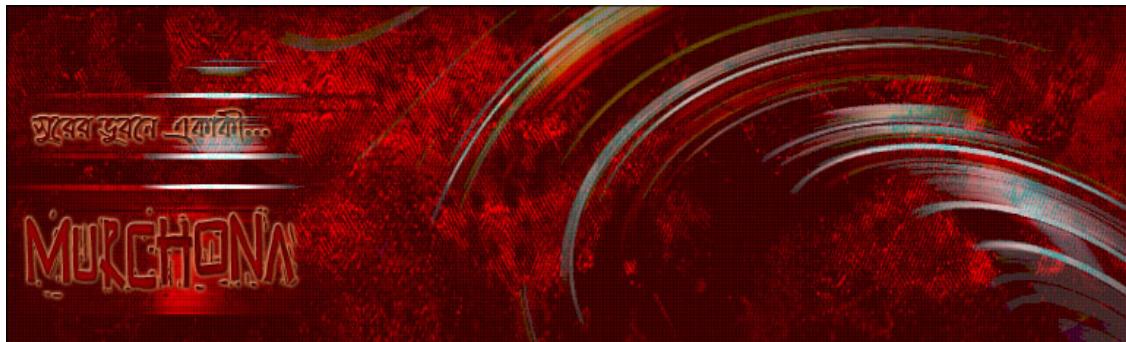
তাছাড়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি। বলে এসেছি স্পেনীয় আর ইংরেজদের, আমি সবার জন্যে

পাঠিয়ে দেব একটা করে বউ। সঙ্গে নতুন নতুন গাছগাছালি। আর কিন্তু জীবজন্ম। যেমন
শুয়োর, গরু আর ভেড়া। গরু অর্থে গাভী। সবৎসা। সঙ্গে দিলাম একটি বলদ। এটা
দরকার। মোটমট চাই আমি—সবদিক থেকে সুফলা হয়ে উঠুক আমার নতুন সাধারণ্য।

এরপরেও আছে। সেটা পরে গিয়ে শুনেছি। তিনশ ক্যারিবীয় এসেছিল ফের দ্বীপে,
লড়াই করে দ্বীপের দখল নিতে। সে যাকে বলে যহুপ্রলয়। ক্ষেত্র জ্বালিয়ে শস্য পূড়িয়ে সে
যেন ছারখার কাণ্ড। হেরে গেছে আমার প্রজার দল। সেটা প্রথমবার। পারে নি প্রতিরোধ
করতে। তিনজন মারা গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর হারে নি। সেবার আগে থেকে সজাগ
ছিল। দিয়েছে মেরে ধরে লুটেরা শয়তানদের তাড়িয়ে। আর এমনই দুর্দশা,—ফিরে যাচ্ছে
দলবল, নৌকো নিয়ে গেছে গভীর সমুদ্রে, অমনি উঠল ঝড়, আর পাহাড় সমান উচু
একেকটা ঢেউ। চোখের নিমেষে সব নৌকো উলটে গেল রসাতলে। তখন শান্তি।
পুনর্গঠনের কাজ তখন শুরু হল। শান্তি। খাটল প্রাণ দিয়ে। শান্তি। ফুলে ফলে ভরে উঠল
আবার দ্বীপ। শান্তি। অপরাপ তার স্বাদ! পূর্ণ হল আবার দ্বীপবাসীর হৃদয়।

আর আমি? ততদিনে আমি কি আর ঘরের কোণে বসে থাকার মানুষ। বেরিয়ে
পড়লাম ফের। সে আর এক অভিযান। দশটা বছর কাটল সেই অভিযানে। কিন্তু সে গল্প
এখানে নয়। বারান্দারে বলার চেষ্টা করব।

Robinson Crusoe by Danial Difo



For More Books & Music Visit www.MurchOna.com

MurchOna Forum : <http://www.murchona.com/forum>

Suman_ahm@yahoo.com

suman_ahm@walla.com

s4suman@yahoo.com